বর্ত্তীকালে অগ্নিনামা মনুষ্যকুলের প্রথম কাহাকেও ধরিতে হইলে হুতাশনের নাম করিতে হয়। এই হুতাশন নামে খ্যাত ব্যক্তিই জগতে প্রথম অগ্নির প্রভাব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। তাই অগ্নির নামে হুতাশন প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন। মহাভারতে এই হুতাশনের ইতিহাস বা বংশাবলীও পাওয়া যায় না যে তাহা নহে। হুতাশন অষ্টবসুর অন্যতম। মহর্ষি মনুর কুলে অষ্টবসুর জন্ম। অষ্ট বসু কাহারা?

ধরো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ অহশ্চৈবানিলোনেলঃ।
প্রত্যুষশ্চ প্রভাষশ্চ বসবোষ্টাবিতি স্মৃতাঃ॥

ধর, ধ্রুব, সোম, অহ, অনিল, হুতাশন, প্রত্যুষ, ও প্রভাব এই আটজন বসু নামে খ্যাত। বসুগণ ও অগ্নি যে এক পিতার সন্তান তাহা ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত বাক্যের দ্বারাও বুঝায়। ঋগ্বেদের সূক্তে আছে "হে অগ্নি! তোমার চতুর্দ্দিকে এক্ষণে তাবৎ বসু উপবেশন করুক"। * এই বসুগণের মধ্যে অনল বা হুতাশন শাণ্ডিলীর তনয় বলিয়া লিখিত আছে।

রতারাশ্চাপ্যহঃ পুত্রঃ শাণ্ডিল্যাশ্চ হুতাশনঃ।

'রতার পুত্র অহ এবং শাণ্ডিলীর পুত্র হুতাশন।' † শাণ্ডিল্য গোত্রের প্রবর্ত্তক শাণ্ডিল্য মুনিও এই অগ্নিমাতা শাণ্ডিলীসম্ভূত তাই শাণ্ডিল্য নামে তিনি খ্যাত হইয়া থাকিবেন ‡ এই হুতাশন বংশেই ভৃগুমুনির জন্ম হয়।

---

* ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল ১৪২ সূক্ত।

† মহাভারত আদি পর্ব্ব ষটষষ্টিতম অধ্যায়।

‡ শাণ্ডিল্য মুনি ও হুতাশন এই উভয়েরই আদিজননী যে শাণ্ডিলী তাহা হরিবংশের নিম্নলিখিত বাক্যের দ্বারাও সমর্থিত হইতেছে। হরিবংশে এক স্থলে আছে—"শাণ্ডিল্য গোত্রোৎপন্ন কোন মহাত্মা হইতে অগ্নির উৎপত্তি শ্রবণ পূর্ব্বক সত্যবান যজমান মহাত্মা দিলীপকে যাঁহারা অবলোকন করিবেন," সেই সমুদয় মানব স্বর্গ-বিজয়ী হইবেন"। বিশেষ-ভাবে শাণ্ডিল্য গোত্রোৎপন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে অগ্নির উৎপত্তি শ্রবণের কথায় বলিবার অর্থ এই যে শাণ্ডিল্য ও অগ্নি উভয়ে এক মাতার সন্তান সেই কারণে অগ্নির উৎপত্তি সম্বন্ধে অন্য গোত্রীয়ের অপেক্ষা শাণ্ডিল্য গোত্রীয় মহাত্মারই অধিক জানা সম্ভব।

ভৃগুর্মহর্ষিভগবান্ ব্রহ্মণা বৈ স্বয়ম্ভুবা।
বরুণস্য ক্রতৌজাতঃ পাবকাদিতি নঃ শ্রুতম্॥

"মহর্ষি ভৃগু বরুণের যাগানুষ্ঠান কালে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকর্ত্তৃক হুতাশন হইতে উৎপাদিত হইয়াছিলেন। * এই ভৃগুবংশ স্বদেশে ও বিদেশে এককালে বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। এই বংশীয় লোকের মধ্যে যাঁহারা অগ্নিসমতেজ[illegible] ও অগ্নিব্যবসায়ী ছিলেন তাঁহারাই অগ্নি উপাধিও লাভ করিয়াছিলেন। অ[illegible] উপাধি ঠিক যে বংশানুক্রমে চলিয়া আসিতেছিল তাহা বলিতে পারা যায়না[illegible] গুণ ও কর্ম্মবশে সেকালে লোকে অগ্নি উপাধি লাভ করিত দেখা যায়। অগ্নি বংশে অগ্নি উপাধি বিশিষ্ট ব্যক্তির সংখ্যা অধিক। প্রজাপতি অ[illegible] কুলে বৃহস্পতির জন্ম হয়, কিন্তু সুরগুরু বৃহস্পতি গুণ ও কর্ম্মভেদে [illegible] উপাধি লাভ করেন নাই, কিন্তু তৎপুত্রেরা হুতাশন উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। মহাভারতে আছে—

বৃহস্পতে শ্চান্দ্রমসী ভার্য্যাভূদ্যাঃযশস্বিনী।
অগ্নিন্ সাজনয়ৎ পুত্রান্ ষড়েকাঞ্চাপি পুত্রিকাম্॥

বৃহস্পতির যশস্বিনী চান্দ্রমসী নামা যে ভার্য্যা তিনি ছয় অগ্নি উপাধিধারী পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। এই অগ্নিদিগের কাহারও কাহারও নাম পরে উল্লিখিত হইয়াছে। যেমন 'শংযু' এক জনের নাম ইত্যাদি।

সোঽগ্নির্বৃহস্পতেঃ পুত্রঃ শংযুর্নাম মহাব্রতঃ। †

"শংযুর জ্যেষ্ঠপুত্র..ভরদ্বাজ" তাহা অব্যবহিত পরেই উক্ত হইয়াছে। এই ভরদ্বাজের বংশধরেরা যে এককালে পূর্ব্বে যোগধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া দুশ্চরিত বশতঃ পতিত হইয়াছিলেন তাহাও হরিবংশে স্পষ্টই লিখিত আছে। ‡ এখনও

---

* আদি পর্ব্ব পঞ্চমাধ্যায়।

† বনপর্ব্ব ২১৮ অধ্যায়।

‡ মার্কণ্ডেয় উবাচ

আসন পূর্ব্বযুগে তাত ভরদ্বাজাত্মজা দ্বিজাঃ।
যোগধর্ম্মমনুপ্রাপ্য ভ্রষ্টা দুশ্চরিতেন বৈ॥

খিল হরিবংশ উনিশ অধ্যায়।

ভারতে ভরদ্বাজ বংশ বিলুপ্ত হয় নাই। বঙ্গদেশে কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চ-গোত্রের পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন তন্মধ্যে একজন ভরদ্বাজ গোত্রীয় ছিলেন। ভরদ্বাজ গোত্রের প্রবর বার্হস্পত্য আঙ্গিরস। অতএব দেখা যাইতেছে ভরদ্বাজ গোত্রের মূলে বৃহস্পতিপুত্র শংযু অগ্নি।

পূর্ব্বেই দেখাইয়া আসিলাম ভৃগুবংশ অগ্নিবংশের শাখামাত্র। এই অগ্নি বা ভৃগু বংশীয় এক জাতি এক্ষণেও ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্যমান, ইহারা আপনাদিগকে ভৃগুকুলোদ্ভব বলিয়া স্বীকার করে। এই ভৃগুবংশীয়েরা কেবল ভারতে নহে অন্যান্য দেশে এমন কি য়ুরোপেও বিস্তার লাভ করিয়াছিলেন। ভারতের দক্ষিণে একটী স্থানের নাম 'ভৃগুকচ্ছ' (Broach)। গ্রীসীয় পুরাণা-খ্যাত অগ্নিদেবের 'ভল্কান' নাম যে ভার্গব নামের অপভ্রংশ তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। 'ভার্গব' হইতে 'ভার্গ" এবং ক্রমে 'র' 'ল" হইয়া 'ভারন্' বা 'ভাল্কন' আসিয়াছে। * ভারতের ভৃগু বা অগ্নি বংশীয়েরা অগ্নির ব্যাপারে এতই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন যে 'ভার্গব' নাম দেশে বিদেশে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই বিদেশেও যাঁহারা অগ্নি সম্বন্ধে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাঁহারা 'ভার্গব' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন দেখা যায়। গ্রিসীয় পুরাণের এই অগ্নিদেব 'ভাল্কন' প্রধানভাবে কাঁমারের কার্য্যে নিযুক্ত দেখা যায়। মহাকবি হোমর এই অগ্নিদেবের বিষয় এমনি জ্বলন্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে তাহা পাঠ করিলে তাঁহার জ্বলন্তমূর্ত্তি যেন আমাদিগের সম্মুখে আসিয়া প্রতিভাত হয়। পাঠকের গোচরের জন্য হোমর হইতে যৎসামান্য অংশ উদ্ধৃত করা গেল।

There the lame architect the goldess found,
Obscure in smoke, his forges flaming round
While bathed in sweat, from fire to fire he flew
And puffing loud, the roaring bellows blew.
Then from his anvil the lame artist rose
Wide with distorted legs oblique he goes,
And stills the bellows and in order laid,

---

* এই অগ্নিদেবের 'ভাল্কান' নাম হইতে সম্ভবতঃ 'ভাল্কানো' volcano শব্দ আসিয়া থাকিবে।

Locks in their chest the instruments of trade;
Then with a sponge the sooty workman dressed
His brawny arms imbrown'd and hairy breast,
With his sceptre graced and red attire
Came halting forth, the sovereign of the fire.

খঞ্জ স্থপতিরে দেবী দেখিলেন ওই
ধুম্রাচ্ছন্ন, লৌহশলা জলে অগ্নিময়ী ;
অগ্নি হ'তে অগ্নিপানে ঘর্ম্মস্নাত ধা'ন ;
ফুসি ঘোর গর্জ্জি, নৃত্য করিছে হাপর,
উঠিলা 'বিশ্বকর্ম্মা' ত্যজি শিল্পী তাপস,
বক্রপদ বিস্তারিয়া বক্রভাবে যান,
হাপরে করেন স্তব্ধ নিয়মের মন্ত্রে
শিল্পকে আবদ্ধ করি ব্যবসার যন্ত্রে ;
স্পঞ্জ হস্তে কর্ম্মকার পরিধিয়া বেশ—
দেখিতে অঙ্গার কৃষ্ণ বক্ষভরা কেশ—
পিঙ্গল পেশিল বাহু, করে রাজদণ্ড—
প্রকাণ্ড শোভন তাহা, সাথে রক্তাম্বর
আসিয়া দাঁড়াইলেন অনল ঈশ্বর।

কবি হোমর যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় গ্রিসীয় অগ্নিদেব কামার ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না। এই "কামার" এর ইংরাজী প্রতিশব্দ 'স্মিথ'। জার্ম্মাণ ভাষায় 'স্মিড্‌ট্‌' বলে। এই "স্মিথ" শব্দের মূলে সংস্কৃত "সমিধ" শব্দ বিদ্যমান। সমিধ শব্দের ধাত্বর্থ সম্যকরূপে ইন্ধন করা অর্থাৎ অগ্নি জ্বালান। আমাদের দেশে পূর্ব্বে যজ্ঞেই অধিক সময়ে অগ্নি সম্যকরূপে প্রজ্বলিত হইত তাই 'সমিধ' শব্দটা আমাদের দেশে যজ্ঞকার্য্যে অধিক ব্যবহৃত হইয়াছে, য়ুরোপে কিন্তু যুদ্ধাদির জন্য লৌহবর্ম্ম প্রভৃতি প্রস্তুত কার্য্যে কর্ম্মকার [illegible] অধিক সময়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইত তাই য়ুরোপে 'সমিধ' শব্দটা কর্ম্মকার [illegible]চক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের অগ্নিবংশীয় ব্যক্তিগণও যে কামা- [illegible] শ্রেণীর ছিলেন [illegible] একটী [illegible] হইতে তাহার প্রমাণ



পাওয়া যায়। এই ঋক্‌টীর এক স্থানে অগ্নি বলিতেছেন—"আমি ইন্দ্রের হুই হস্তে বজ্র সন্নিবেশিত করি, তবে তিনি এই সমস্ত বিপক্ষ জয় করেন। * গ্রীসার অগ্নিদেব ভাল্কানও গ্রীসীয় বজ্রধর 'জুপিটর' এর বজ্র প্রস্তুত করিয়া দিতেন। †

য়ুরোপে 'ভার্গব' নামের প্রচার আর একটী শব্দের আলোচনার দ্বারা বুঝা যাইবে। শুক্রবারকে ইংরজীতে 'ফ্রাইডে' বলে। 'ফ্রাইডে'র সংস্কৃত নাম শুক্রবার। ভৃগুকুলপ্রসূত বলিয়া শুক্রমুনির আরেক নাম 'ভার্গব"। ভৃগু শব্দ 'ভৃজ' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

ভৃজি পাকে ভবেদ্ধাতুর্যস্মাৎ পাচয়তে হ্যসৌ।

(যোগিযাজ্ঞবল্ক্য)

ভৃজ ধাতুর অর্থ পাক করা। আমাদের দেশের "ভাজি" ও ইংরাজী 'ফ্রাই' Fry শব্দ এই পাকার্থ ভৃজ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। "ভাজি" ও ইংরাজী "ফ্রাই" শব্দের মধ্যবর্ত্তী আরেকটী শব্দ পাওয়া যায় তাহা "ফেরিজি"। "ফেরিজি" একবিধ খাবারের নাম। সচরাচর ভাজা মাংস প্রভৃতিকে "ফেরিজি বলে। "ভৃজি"র 'ভ' 'ফ'তে পরিণত হইয়া 'ফেরিজি" রূপ ধরিয়াছে মাত্র। "ফেরিজি" অপেক্ষাকৃত আরও সংক্ষিপ্ত হইয়া 'ফ্রাই' হইয়াছে। একটী ভাষা হইতে ভাষান্তরে পরিভ্রমণ কালে শব্দ মধ্যস্থিত 'ভ' যে অনেক সময়ে 'ফ' রূপ প্রাপ্ত হয় তাহা অন্যান্য উদাহরণ দ্বারা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। ইংরাজী 'ফাণ্ড' Fund শব্দ যাহার অর্থ পুঁজী তাহা ভারতের ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞীয় ঘৃতাদি পুঁজী করিবার আধার 'ভাণ্ড' শব্দ হইতে আসিয়াছে; যখন পুঁজী বাড়িল তখন আর 'ভাণ্ডে' কুলাইল না, ক্রমে এই 'ভাণ্ড' শব্দ

---

* ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ৫২ সূক্ত।

† Vulcan was the god of fire, and the patron of all those artists who worked in iron or other metals. He forged the thunderbolts of Jupiter, and the arms of the gods and Demigods.

Mythology of Greece.

হইতে 'ভাণ্ডার" শব্দের সৃষ্টি হইল। বাহুল্য ভয়ে আর অন্য উদাহরণ দিবার আবশ্যক বোধ করি না। এই এক ভৃজ ধাতু ভৃগু, ভর্গ, ভাজি, ফেরিজি, ফ্রাই প্রভৃতি স্বদেশী ও বিদেশী নানা শব্দের মূলে বিদ্যমান। * সকলেরই মূল ধাতুঘটিত অর্থ একই। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে 'ভাজি' অর্থ বাচক ইংরেজী 'ফ্রাই' শব্দ যেমন 'ভৃজ' ধাতু হইতে উৎপন্ন সেইরূপ 'ফ্রাইডে' শব্দের 'ফ্রাই'ও ভৃজ ধাতুমূলক 'ভৃগু' শব্দ হইতে আসিয়াছে। ভারতের পুরাণেতিহাসের মতে ভৃগুনন্দন শুক্র অসুরগুরু ছিলেন। হিন্দুরা শুক্রবারকে ভৃগুবার বা ভার্গববারও বলিয়া থাকে। পাশ্চাত্যেরা যাহাদিগকে "শেমিটিক জাতি" নামে অভিহিত করেন তাহারা প্রধানত দিতির বংশসম্ভূত অসুর কুল বা অসুর জাতি ভিন্ন কিছুই নহে। সেমিটিক জাতির আবাস ভূমির আসিরিয়া নাম অসুর নাম হইতেই সম্ভবতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। এক্ষণে অসুরকুলের অধিকাংশই মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। তাই দেখা যায় প্রাচীন সংস্কারবশতঃ মুসলমানদিগের নিকট অসুরগুরুর নামধারী শুক্রবার পবিত্রবার। এই অসুরকুল দ্বিজবর ভৃগুনন্দন শুক্রকে গুরুত্বপদে বরণ করিয়া এককালে নানা বিষয়ে উন্নতি করিয়াছিল। এইসকল আলোচনার দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি ভৃগু বা অগ্নিবংশ এককালে পাশ্চাত্য জগতে বড় কম প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই। অগ্নিকে সহায় করিয়াই এই অগ্নিবংশ লোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

গাধিপুত্র বিশ্বামিত্রের সহিত এই অগ্নিবংশের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। যদিও বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়কুলপ্রসূত তথাপি সে সময়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি দ্বিজ জাতির মধ্যে বর্ণভেদের তত বাঁধাবুঁধি ছিলনা। বিশ্বামিত্র গাধি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহার মনের গতি ব্রাহ্মণ্যের দিকে ধাবিত ছিল। ব্রাহ্মণ বংশের মধ্যে অগ্নি বা ভৃগুবংশকে জ্ঞানে, গুণে ও বিদ্যায় অগ্রণী দেখিয়া বিশ্বামিত্র এই বংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া স্বয়ং ব্রাহ্মণত্বে উপনীত হইবার মনস্থ করিয়াছিলেন। পুরাকালে ভৃগুকুলের মহিমা যে কি পর্য্যন্ত ছিল তাহা বুঝা যায় যখন দেখি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভৃগুপদচিহ্নধারী। বিশ্বা-

---

* ইংরাজী 'ভর্জিন' (virgin) শব্দেরও মূল ভৃজধাতু।

মিত্রের পূর্ব্ব হইতেও গাধিকুলের সহিত অগ্নিকুলের বৈবাহিক আদান প্রদান চলিতেছিল। যে ইলাপুত্র চন্দ্রবংশীয় মহারাজা পুরুরবা গন্ধর্ব্বলোক হইতে শিক্ষা করিয়া ভারতে ত্রেতাগ্নি স্থাপন করেন তিনি গাধিকুলের পূর্ব্বপুরুষ। এই অগ্নি স্থাপয়িতার কুলজাতদিগের স্বভাবতই যে অগ্নি ও অগ্নিবংশের প্রতি শ্রদ্ধা হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি। বিশ্বামিত্রের পূর্ব্বেই গাধিরাজের কন্যা সত্যবতীর সহিত অগ্নি বা ভৃগুবংশীয় ঋচিকের বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল

গাধেঃ কন্যা মহাভাগা নাম্না সত্যবতী শুভা
তাং গাধিঃ কাব্যপুত্রায় ঋচিকায় দদৌ প্রভুঃ॥
তস্যাঃ প্রীতোভবদ্ভর্ত্তা ভার্গবো ভৃগুনন্দনঃ
পুত্রার্থং কল্পয়ামাস চরুং গাধেস্তথৈবচ॥

গাধিরাজ, কাব্যপুত্র ভৃগুনন্দন ঋচিককে সেই মহাভাগা সত্যবতী নাম্নী সুন্দরী কন্যা সম্প্রদান করেন। ভর্ত্তা ভৃগুনন্দন তাঁহার প্রতি প্রীত হইলেন এবং নিজ পুত্র ও গাধির পুত্রের নিমেত্ত চরু প্রস্তুত করিলেন।" * মহামনা গাধিবংশের ক্ষাত্রবল ও ভৃগুবংশের ব্রহ্মতেজের সংযোগে বহু খ্যাতনামা মুনির জন্মলাভ হইয়াছিল। গালব, মধুচ্ছন্দ, সৌশ্রুত, যাজ্ঞবল্ক্য ও অঘমর্ষণ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ মুনিগণ এইরূপ ক্ষত্রিয় গাধিবংশ ও ব্রাহ্মণ ভৃগুবংশের সম্মিশ্রণে উৎপত্তি হইয়াছে। ইতিহাসে স্পষ্টই আছে,—

বিশ্বামিত্রস্তু ধর্ম্মাত্মা নাম্না বিশ্বরথঃ স্মৃতঃ
জজ্ঞে ভৃগুপ্রসাদেন কৌশিকাদ্বংশবর্দ্ধনঃ॥

"ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র বিশ্বরথ নামে স্মৃত হইয়াছিলেন, তিনি ভৃগুপ্রসাদে বংশবর্দ্ধন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। †

অব্যবহিত পরেই বিশ্বামিত্রের বংশধরগণেরও নাম উল্লেখ করা হইয়াছে।

বিশ্বামিত্রস্য পুত্রাস্তু দেবরাতাদয়ঃ স্মৃতাঃ।
বিখ্যাতাস্ত্রিষু লোকেষু তেষাং নামানি মে শৃণু॥

---

* হরিবংশ সাতাশ অধ্যায়।

† হরিবংশ সাতাশ অধ্যায়।

দেবশ্রবাঃ কতিশ্চৈব যস্মাৎ কাত্যায়নাঃ স্মৃতাঃ।

*　*　*　*

সাংস্কৃতি গালবশ্চৈব মুদ্গলশ্চেতি বিশ্রুতাঃ
মধুচ্ছন্দাদয়শ্চৈব দেবলশ্চ তথাষ্টকঃ

*　*　*　*

সৌশ্রুতাঃ কৌশিকা রাজন্ তথান্যে সৈন্ধবায়নাঃ
দেবলা রেণবশ্চৈব যাজ্ঞবল্ক্যাঘমর্ষণাঃ

কৌশিকের এই বংশে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সম্বন্ধ লোকবিখ্যাত আছে তাহাও বলা হইয়াছে—

সম্বন্ধোপ্যস্য বংশেস্মিন্ ব্রহ্মক্ষত্রস্য বিশ্রুতঃ।

ক্ষত্রিয় বৃত্তিধারী ব্রাহ্মণতনয় পরশুরামও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রক্তের সম্মিশ্রণে উৎপন্ন। তিনি ভৃগুনন্দন ঋচিকের ঔরসে ও গাধিকন্যা সত্যবতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ইতিহাসে ইহা স্পষ্টই লিখিত আছে। ভৃগুবংশের প্রতি বিশ্বামিত্রের যে বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল বিশ্বামিত্রপ্রণীত গায়ত্রী মন্ত্র হইতেও তাহার যেন কতকটা আভাস পাওয়া যায়। তৎপ্রিয় ভৃগু নামটী তাঁহার মনে যেন সর্ব্বদা গ্রথিত রহিয়াছে। গায়ত্রী মন্ত্রের মধ্যে 'ভৃগু' শব্দের সহোদর ভর্গ শব্দটী নিবিষ্ট করিয়া দিয়া তিনি যেন ইহা কতকটা প্রকাশ করিয়াছেন। এই তেজস্বী ভৃগুবংশের প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃ তিনি সবিতার তেজকে 'ভর্গো' শব্দে ব্যক্ত না করিয়া যাইতে পারেন নাই।

"তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি"

ঋগ্বেদের সর্ব্বপ্রথম স্থক্তে, যে ঋষি অগ্নির স্তুতি গাহিয়াছেন তিনি মধুচ্ছন্দা ঋষি বিশ্বামিত্রের বংশধর। পূর্ব্বেই বলিয়া আসিলাম যে মধুচ্ছন্দা ঋষি গাধিকুল ও ভৃগুকুলের সম্মিশ্রণে উৎপন্ন। তাই স্বভাবতঃই বৈশ্বামিত্র মধুচ্ছন্দার ভৃগু-বংশের উপর টান হওয়া কিছু অসম্ভব নয়। ভৃগুবংশও যাহার নাম অগ্নি-বংশও তাহারি নাম। তাই ঋষি মধুচ্ছন্দা অগ্নির স্তুতি গাহিয়া নিজবংশেরই মহিমা গান করিয়াছেন। ইহা যে কেবল প্রাকৃতিক অগ্নির স্তুতি তাহা বলা যায়না। বরঞ্চ প্রাকৃতিক অগ্নি অপেক্ষা ইহা অগ্নিকুলেরই স্তুতি, তবে সেই সঙ্গে দ্ব্যর্থ সহকারে প্রাকৃতিক অগ্নির উপরেও অনেকটা লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

দ্ব্যর্থ ও অনেকার্থ অলঙ্কারে বাক্য প্রয়োগ করা অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবাসীর প্রকৃতিসিদ্ধ। এই কারণে গায়ত্রী মন্ত্র জ্ঞানী ঋষিদিগের নিকট ঈশ্বর অর্থবাচকও বটে এবং সাধারণের নিকট সূর্য্যার্থবাচকও বটে। আমরা দেখিতে পাই যে, ঋগ্বেদের অগ্নিস্তোত্রগুলি অনেকাংশে পূজ্য ব্যক্তির উদ্দেশে লিখিত। সে পূজ্য ব্যক্তিগণ আর কেহই নহে পূজ্য অগ্নিকুলের মহাত্মাগণ। অগ্নিস্তোত্রে যে, অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত, হোতা, যজ্ঞের দেবতা প্রভৃতি সম্মানে সম্মানিত হইয়াছেন সে সম্মানের প্রধান লক্ষ্য অগ্ন্যুপাধিক যাজ্ঞিক মহাত্মাগণ। কিন্তু অগ্নিবংশের প্রতি ইহার যেমন লক্ষ্য সেইরূপ প্রাকৃতিক অগ্নির উপকারিতার জন্য তাহারও প্রতি কথঞ্চিৎ লক্ষ্য নাই যে তাহাও নহে। যেমন পুরোহিত ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্যে দেবতার বা ঠাকুরের মাহাত্ম্য সেইরূপ অগ্নিবংশের মাহাত্ম্য-গানে প্রকৃতিক অগ্নিরও মাহাত্ম্যগান আপনা হইতেই হইয়া পড়ে। কারণ অগ্নিবংশীয়েরা অগ্নির সাহার্য্যেই জগতে যাহা কিছু খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

মধুচ্ছন্দা ঋষি গাহিয়াছেন—

অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ

"অগ্নি হোতা, কবি, সত্যপরায়ণ প্রভূত ও বিবিধ কীর্ত্তিযুক্ত"

পুনশ্চ—

উপত্বাগ্নে দিবে দিবে দোষা বস্তর্ধিয়া বয়ং নমো ভরন্ত এমসি

"হে অগ্নি আমরা দিনে দিনে দিবারাত্র মনের সহিত নমস্কার করতঃ তোমার সমীপে আসিতেছি"। অচেতন প্রাকৃতিক অগ্নির অপেক্ষা অগ্ন্যুপাধিক মনুষ্যই এসকলের বিশেষ লক্ষ্য। কেবল মধুচ্ছন্দা ঋষি নহে ঋগ্বেদের অন্যান্য ঋষিগণও অনেকস্থলে মনুষ্য অগ্নিরই গুণকীর্ত্তন করিয়া সূক্ত রচনা করিয়া গিয়াছেন। * ঋগ্বেদের একটী সূক্তে উপস্তুত ঋষি অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন "হে উৎকৃষ্ট পিতার সন্তান! তোমার তুল্য অন্নবান কেহ নাই,

---

* তাই বলিয়া প্রাকৃতিক অগ্নির উদ্দেশে যে আদোপেই সূক্ত রচিত হয় নাই তাহা নহে।

তুমি বলবান, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং বিপদের সময় ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক রক্ষা করিয়া থাক"। * প্রাকৃতিক অচেতন অগ্নি বিপদের সময়ে ধনু কিরূপে ধারণ করিবে? ইহা হইতেই পারেনা। ইহাদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে এই সকল সূক্তের প্রধান লক্ষ্য মনুষ্য অগ্নি।

ঋগ্বেদের অনেকগুলি সূক্তেরই অগ্নি ঋষি বলিয়া উল্লেখ আছে অর্থাৎ সেই সেই সূক্তগুলির রচয়িতা অগ্নি ঋষি। এই অগ্নি ঋষি একটী সূক্তে নিজের কথা নিজেই বলিতেছেন।

"হে বিশ্বদেব! আমাকে হোতারূপে বরণ করিয়াছে, আমি এইস্থানে আসন লইয়া যে মন্ত্র পাঠ করিব, তাহা বলিয়া দাও * * *

আমি হোতা হইয়া যজ্ঞ করিব বলিয়া বসিয়াছি, সকল দেবতা ও মরুৎগণ আমাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে। * *

আমি অগ্নি পলায়ন করিয়াছিলাম, অনেক কষ্ট করিতেছিলাম, আমাকে দেবতারা হব্যবাহ নিযুক্ত করিয়াছেন।

হে দেবগণ! আমি তোমাদিগের পরিচর্য্যা করিতেছি, অতএব তোমাদের নিকট প্রার্থনা করি, আমাকে অমর কর, সন্তান সন্ততি দাও। †

উপরোক্ত সূক্তটীতে পাঠক দেখিলেন যে অগ্নিঋষি নিজেই নিজের বিষয় বলিতেছেন" —"আমাকে হোতারূপে বরণ করিয়াছে" "আমি হোতা হইয়া যজ্ঞ করিব বলিয়া বসিয়াছি" ইত্যাদি। প্রকৃত কথা এই যে অগ্ন্যুপাধিক ঋষিরাই যজ্ঞাদি অগ্নি সম্পর্কীয় কার্য্যে সমধিক জ্ঞানবিশিষ্ট ও সুনিপুণ বলিয়াই তাঁহারা যজ্ঞাদি কার্য্যে পৌরোহিত্য প্রভৃতি প্রধান পদে নিযুক্ত হইতেন। এবং এই কারণে অগ্নি বৈদিক যুগ এবং তাহারও পূর্ব্ব হইতে লোকে সম্মান ভাজন হইয়া আসিতেছেন। পাঠক এক্ষণে বুঝিবেন ঋগ্বেদের "অগ্নিমীলে পুরোহিতং হোতারং যজ্ঞস্যদেবং" প্রভৃতি ঋকগুলি মুখ্য ভাবে অগ্নিনামা এবং অগ্নিপ্রাণ ঋষিদিগেরই স্তব করা হইয়াছে এবং এইসঙ্গে সমগ্র অগ্নির প্রতি গৌণভাবে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

---

* ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল, ১১৫ সূক্ত।

† এই সূক্তটীর বিশ্বদেবগণ দেবতা এবং ঋষি অগ্নি ১০ম মণ্ডল ৫২ সূক্ত।

আশ্চর্য্য এই যে পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকদীপ্ত ভারতবাসীগণ কেহই এপর্য্যন্ত বেদ পুরাণের অন্তর্নিহিত এই সকল ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানে যত্নবান নহেন। এই কারণে তাঁহারা অগ্নি প্রভৃতি বিষয়ক বৈদিক সূক্ত ও পৌরাণিক আখ্যান-গুলিকে অগ্নি প্রভৃতি অচেতন পদার্থের উপাসনা বুঝিয়া হেয় চক্ষে দৃষ্টি করেন। তাহা না করিয়া অগ্নি ও যজ্ঞের নিগূঢ় তত্ত্বের দিকে যদি একবার প্রণিধানপূর্ব্বক দেখেন তাহাহইলে বুঝিতে পারিবেন অগ্নি ও যজ্ঞ মনুষ্য মাত্রেরই আদরের বস্তু।

শ্রীঋতেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

ব্রাহ্মসমাজ ও স্ত্রীশিক্ষা।

পূর্ব্বেই দেখিয়া আসিয়াছি যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় স্ত্রীশিক্ষার প্রথম সূত্র ধরাইয়া দিয়া গিয়াছেন এবং ব্রাহ্মসমাজের অধীনস্থ তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই বিশেষ যত্নে বিটন বিদ্যালয় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এইবারে দেখিব যে স্ত্রীশিক্ষা ব্রাহ্মসমাজ হইতেই কিরূপে উচ্চ আদর্শ লাভ করিয়া কৈশোর হইতে বাল্যে পদার্পণ করিবার উপক্রম করিল। সকলেই অবগত আছেন যে সর্ব্বপ্রথম কলিকাতা মহানগরীর মধ্যে, সমগ্র ভারতবর্ষে একটিমাত্র ব্রাহ্মসমাজ বর্ত্তমান ছিল এবং মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃকই তাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজা রাম-মোহন রায়ের সময়ে এই ব্রাহ্মসমাজের নাম ব্রহ্মসভা ছিল, ক্রমে তাহা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইল; আরও পরে সেই আভ্যন্তরীণ বিরোধানল প্রজ্জলিত হইয়া সমাজকে বিচ্ছিন্ন করিবার পর অবধি তাহার নাম আদিব্রাহ্মসমাজ হইল। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা অবধি এবং এই গৃহবিবাদের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্রহ্মোপাসক-মাত্রকেই "কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজেরই" আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। রাম-মোহনরায়ের পরলোকগমনের পর শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ যোড়া-

সাঁকোর ঠাকুর পরিবারই এই ব্রাহ্মসমাজের ভার কিছু বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সেই নবীন অভ্যুদয়কালে তাহা সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পরিপোষক হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং সামাজিক উন্নতির একটি প্রধান নিদান স্ত্রীশিক্ষাবিষয়েও যে উক্ত ঠাকুর পরিবার ও ব্রাহ্মসমাজ অগ্রসর হইতে পরাঙ্মুখ হন নাই, তাহা বলা বাহুল্য। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট বিটন বিদ্যালয়ের ভার লইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই অবধি যে স্ত্রীলোকের সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার বিশেষ একটা বিস্তার হইয়াছিল তাহা নহে। প্রত্যুত ইহার পরেও বহুকাল যাবৎ এই বিদ্যালয় প্রকৃত পক্ষে শিশুবিদ্যালয় ছিল। * ব্রাহ্মদিগের স্ত্রী কন্যাদিগের মধ্যেও যে তখন লেখাপড়ার বেশী চর্চ্চা হইয়াছিল, তাহাও নহে। বরঞ্চ অনুসন্ধানে যতদূর জানা যায় তাহাতে বুঝিতে পারি যে তখন হিন্দুসমাজের কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেই স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ প্রচলন হয় নাই। যে দুই এক পরিবার কন্যাদিগকে বিটনবিদ্যালয়ে ৯। ১০ বৎসর বয়সে ক খ শিখিবার জন্য প্রেরণ করিতেন, তাঁহারাও দুই এক বৎসর পরেই তাহাদিগের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিতে পারিলেই লেখাপড়ার সঙ্গে সম্বন্ধ চির-বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেন। তখনও ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ১৪ বৎসরের ন্যূন বয়সে কন্যার বিবাহ দেওয়া অসঙ্গত বলিয়া স্থির হয় নাই এবং স্ত্রীশিক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া তখনও ব্রাহ্মসাধারণের মধ্যে গৃহীত হয় নাই। সুতরাং তখন ব্রাহ্মপরিবারেও কন্যাদিগের বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইবার সঙ্গে সঙ্গে যে তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার পথ অনেকটা চিররুদ্ধ হইয়া যাইত, তাহা অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ করি না। অবশেষে যোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার বিশেষভাবে স্ত্রীশিক্ষার পথপ্রদর্শন করিলেন এবং ইহার প্রভাব বাগ্মীবর ৺ কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কার্য্য করাতে স্ত্রীশিক্ষা ভারতে বিস্তৃত আকার ধারণ করিতে সক্ষম হইল।

---

* "It was afterwards taken over by the Government, but for a long time it continued to be a mere Infant-day-school for Hindoo girls." Annual Report 24-2-99.

বিটনবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার বিষয় উল্লেখ করিবার কালে বলিয়া আসিয়াছি যে, বংশবাটী নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ৺ হরদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এক কন্যা উক্ত বিদ্যালয়ের অন্যতর প্রথম ছাত্রী। ইহাঁর আর এক কন্যার সহিত যোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের গোষ্ঠীপতি ও ব্রাহ্মসমাজের প্রধানাচার্য্য শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম পরলোকগত পুত্র পূজ্যপাদ ৺ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভবিবাহ সংঘটিত হয়। আজ ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তদানীন্তন বাসভূমি হাবড়ার অন্তর্গত সাঁত্রাগাছীতে এই শুভকার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছিল। ইহারই চার বৎসর পূর্ব্বে স্বনামধন্য ৺ কেশবচন্দ্র সেন মহোদয় ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। কেশববাবু ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার পরেই যুবক ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব উৎসাহ-ঝটিকা উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে দেখা যায় যে, কেশববাবু ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইবার কিয়ৎকাল পরে স্বীয় গৃহ হইতে আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথের বাটীতে সস্ত্রীক আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, দেবেন্দ্রনাথের পুত্রগণ কেশববাবুকে সহোদরের অধিক করিয়া আলিঙ্গন প্রদান করিয়াছিলেন। কেশববাবু ঠাকুর-পরিবারের সহিত একত্র অবস্থান কালে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারেও যেমন এক অদম্য উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ স্ত্রীশিক্ষাবিষয়েও দেবেন্দ্রগৃহে দৃষ্টান্তের বল পাইয়া যথাসময়ে বক্তৃতাদি দ্বারা তাহার প্রচারকার্য্যে যথেষ্ট যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ঠাকুরপরিবারে কেশববাবুর আশ্রয়গ্রহণের কিছু পূর্ব্ব হইতেই একটী মিশনরি মেম দেবেন্দ্রনাথের কন্যা, পুত্রবধূ প্রভৃতিকে শিক্ষা দিতে আসিতেন। তখনকার কালে তাহাই যথেষ্ট বোধ হইয়াছিল। শুনিয়াছি কেশববাবু ইহাঁদিগের শিক্ষা দেখিয়াই স্বীয় পত্নীকে বিদ্যাশিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিছুকালপরে ঘটনাচক্রে মিসনরি মেমের শিক্ষাদান রহিত হইয়া গেল। কিন্তু উক্ত ঠাকুর পরিবারের এক ব্যক্তি, সূক্ষ্মদর্শী ও দূরদর্শী হেমেন্দ্র-নাথ বুঝিয়াছিলেন যে, যে ধর্ম্ম যতই কেন উৎকৃষ্ট এবং যতই কেন ধুমধামের সহিত, উৎসবদিবসে যতই কেন আড়ম্বরের সহিত প্রচারিত হউক না, যে রমণী স্বামীর সহধর্ম্মিণী, যে রমণী সন্তানজননী, সেই রমণীহৃদয়ে যতদিন না

সেই ধর্ম্ম হৃদয়ের বস্তুরূপে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইবে, ততদিন সেই ধর্ম্মের স্থায়িত্ব আশা করা বৃথা এবং তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে ভালরূপে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়াই হৃদয়ে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার এক প্রধান সহায়। ইহা বুঝিয়া হেমেন্দ্রনাথ বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার ভগ্নী, জ্যেষ্ঠভ্রাতৃজায়া প্রভৃতি পরিবারস্থ মহিলাদিগকে বাঙ্গালা শিক্ষা দিতেন—এইরূপে তাঁহারা মেঘনাদবধকাব্য পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। বিবাহের পর তিনি স্বীয় পত্নীকেও শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্রমে বিষয়কর্ম্মের গুরুভার তাঁহার স্কন্ধে ন্যস্ত হওয়াতে তাঁহার স্বয়ং শিক্ষা দিবার ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। তখন তিনি তাঁহার পত্নী ও পরিবারস্থ অন্যান্য মহিলাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য সুবিখ্যাত "ব্রাহ্মবিদ্যালয়" প্রণেতা, বৃদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক ৺ অযোধ্যানাথ পাকড়াশীকে নিযুক্ত করিলেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষাও দিতে লাগিলেন। হেমেন্দ্রনাথের বিবাহের প্রায় এক বৎসর পরেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ সত্যেন্দ্রনাথ বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে কর্ম্মক্ষেত্র বোম্বাই অঞ্চলে লইয়া চলিলেন। অপর মহিলাগণও ক্রমে আপনাপন পতির সহিত পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়া পড়িলেন এবং তাঁহাদের একত্র শিক্ষার ব্যবস্থাও সুতরাং ভাঙ্গিয়া গেল।

ইহাতেই কি সেই অটলপ্রতিজ্ঞ বীরহৃদয় হেমেন্দ্রনাথের স্ত্রীশিক্ষা দিবার প্রতিজ্ঞা শিথিল হইবে? যাঁহার হৃদয়ে ঈশ্বরপ্রীতি ও মাতৃভক্তি প্রগাঢ়তা লাভ করিয়াছিল, যে প্রাতঃস্মরণীয় পূজ্যপাদ হেমেন্দ্রনাথ স্বীয় মাতৃদেবীর জন্য অকাতরে প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তিনি যে স্বীয় পত্নী ও কন্যাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিবেন, তাহা কি কিছু আশ্চর্য্যের বিষয়? এক সময়ে তাঁহার মাতৃদেবীর হস্তের একটি অঙ্গুলি দৈবদুর্বিপাকে ভাঙ্গিয়া গিয়া শোথরোগের কারণ হইয়াছিল; চিকিৎসকেরা শোথের স্থানে অপর কোন ব্যক্তির মাংস কাটিয়া সংলগ্ন করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু কোন্ ব্যক্তি মাতার জন্য আপনার জীবনকে তুচ্ছ ভাবিতে পারেন?—যাঁহার মাতৃভক্তি ঈশ্বরপ্রীতির সহিত সমান আসন লাভ করিয়াছে, তিনিই স্বীয় জীবনের বিনিময়ে মাতার জীবনরক্ষায় উদ্যত হইতে পারেন। হেমেন্দ্রনাথ স্বীয় মাতৃদেবীর জীবনরক্ষার্থ বাহুমূ

হইতে দৈর্ঘ্যপ্রস্থে প্রায় ৩ বর্গ ইঞ্চি পরিমিত মাংসখণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন। এই মাতৃভক্ত সন্তান যে স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে প্রাণপর্য্যন্ত পণ করিবেন, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

একত্র শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া গেলেও হেমেন্দ্রনাথ স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে রীতিমতই শিক্ষা দিতে লাগিলেন—একদিকে ইংরাজী ভাষার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সেক্ষপীয়রের নাটক, মিল্টনের "প্যারাডাইজলষ্ট" প্রভৃতি কাব্য, অপরদিকে সংস্কৃতভাষার কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি সাহিত্যমহারথীর গ্রন্থ, অলঙ্কারশাস্ত্র প্রভৃতি, কখনও বা শিক্ষক রাখিয়া, কখনও বা স্বয়ং শিক্ষা দিতে লাগিলেন। জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য যেমন ভাল ভাল পুস্তক পড়ান হইতে লাগিল, হৃদয়ের উন্নতির জন্য সেইরূপ সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি অনুশীলিত হইতে লাগিল। হেমেন্দ্রনাথ নিজব্যয়ে আদিব্রাহ্মসমাজের পুরাতন সুপ্রসিদ্ধ বৃদ্ধ গায়ক (বর্ত্তমানে পেন্সনপ্রাপ্ত) শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে পত্নীর সঙ্গীত শিক্ষার জন্য, সেতার প্রভৃতি যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষাপ্রদান করিতে সুপ্রসিদ্ধ যন্ত্রবাদক বেণীমাধব বাবু প্রভৃতি ওস্তাদগণকে এবং চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ দেশীয় চিত্রকর শ্রীযুক্ত কালিদাস পাল ও বিদেশীয় চিত্রকর শ্রীযুক্ত হোয়াইট সাহেবকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হেমেন্দ্রনাথ একটি চৌকিতে বসিয়া পরিদর্শন করিতেছেন, তাঁহার পত্নী ঐসকল বিদ্যা যথাসময়ে শিক্ষা করিতেছেন, এবং নিয়মিত সময় উপস্থিত না হওয়াতে তাঁহার সন্তানেরা দৃষ্টান্তগুণে আপনাদিগকে উদারতামণ্ডিত করিতেছে— এই চিত্র যিনি একবার দেখিয়াছেন তিনি কখনই ভুলিতে পারিবেন না এবং আমরাও তাহা ভুলিতে পারি নাই। গৃহস্থ পরিবারের স্ত্রীলোক যে সুভাব সঙ্গীত, স্বহস্তেঅঙ্কিত চিত্র প্রভৃতি দ্বারা নিজের এবং পিতামাতা, স্বামী, পুত্রকন্যা, শ্বশুর ও শ্বশ্রূ প্রভৃতির মনোরঞ্জন করিতে পারিবে, কৃতপক্ষে তাহার পথ হেমেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক উন্মুক্ত হইল। হেমেন্দ্রসহধর্ম্মিণী সকল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার কতকগুলি আজও সযত্নে রক্ষিত আছে; আশাকরি, সেইগুলির অনুলিপি এই পত্রে প্রকাশিত হইতে পারিবে। হেমেন্দ্রপত্নী বিদ্যাভ্যাসে মনোনিবেশ করিলেও গৃহকর্ম্মে একদিনও

অবহেলা প্রদর্শন করেন নাই। গৃহলক্ষ্মী তাঁহার শ্বশ্রূদেবীর পরামর্শে রন্ধনাদি গৃহকর্ম্ম শিক্ষা করিয়া পরিণামে তিনি নিজেই গৃহলক্ষ্মী হইয়া পড়িলেন। দৈবদুর্বিপাকে আঘাত প্রাপ্তির কারণে চক্ষুরোগাক্রান্ত হইয়া যতদিন না চিকিৎসক কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছিলেন, ততদিন বাটীর উৎসব প্রভৃতি বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে অন্নপরিবেশনে, পরিবারস্থ কোন ব্যক্তির রোগ হইলে তাঁহার শুশ্রূষা ইত্যাদি যে সকল সাধুকর্ম্মে অক্লান্ত পরিশ্রম আবশ্যক হইত, সেই সকলেতেই হেমেন্দ্রপত্নী অগ্রসর হইতেন। ক্রমে তাঁহার পুত্রকন্যায় অনেকগুলি সন্তান হইল, কিন্তু তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে বলিয়া যে লেখাপড়া করিবার অবসর পাইতেছেন না, এরূপ কথা একদিনেরও জন্য তাঁহার মুখে শ্রবণ করা যায় নাই। হেমেন্দ্রনাথ স্বীয় পত্নীর দৃষ্টান্তে নবাযুগের বঙ্গললনাদিগকে সর্ব্বপ্রথম দেখাইলেন যে গৃহকর্ম্মের গুরুভার গ্রহণ করিয়াও স্ত্রীলোক উচ্চ অঙ্গের বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারেন।

হেমেন্দ্রনাথ যে তাঁহার পত্নীকে এরূপ সুশিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহাদিগের উভয়েরই স্বাভাবিক বিনয়বশত কোন কার্য্যে আবশ্যক না হইলে তাহা প্রকাশ পাইত না। হেমেন্দ্রপত্নীর এইরূপ শিক্ষার প্রভাব অবশ্য অত্যন্ত পরিচিত আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ বিস্তৃত হইতেছিল, কিন্তু বঙ্গীয় সমাজে সাধারণভাবে বিস্তৃত হয় নাই। হেমেন্দ্রনাথের প্রথম কন্যা শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবীর শিক্ষা হইতেই সর্ব্বসাধারণে স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা সম্যক্ উপলব্ধ হয়। হেমেন্দ্রনাথ যে তাঁহার কন্যার শিক্ষার বিজ্ঞপ্তিপ্রকাশের জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন তাহা নহে; সুগন্ধপুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে গন্ধবহ যেরূপ তাহার সুবাস চতুর্দিকে বিকীর্ণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে ও অনুকূল ঘটনাচক্রে প্রতিভাদেবীর শিক্ষাসৌগন্ধ চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। তখনকার কালে সর্ব্বতোমুখীন শিক্ষাবিষয়ে কোন বঙ্গমহিলাই তাঁহার ন্যায় শিক্ষাবিষয়ে অগ্রসর হন নাই।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রাস্কোভিয়া।

এইরূপে কয়েক দিবস গমন করিয়া তাহারা একাথেরিনেনবর্গ নগরে উপনীত হইল। তাহারা তথায় যে পান্থশালায় অবস্থিতি করিল তাহার অধ্যক্ষ একদিবস কথাপ্রসঙ্গে বিবি মিলিন নামক তত্রত্য এক সহৃদয়া রমণীর নামোল্লেখ করিল। সেই কামিনী নিরতিশয় দয়াশীলা ছিলেন; অন্যের দুঃখ দেখিলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিতা হইতেন এবং সাধ্যানুসারে তাহার দুঃখ-বিমোচনে যত্ন করিতেন। অধ্যক্ষমুখে বিবি মিলিনের এরূপ প্রশংসা শ্রবণ করিয়া প্রাস্কোভিয়া স্থির করিল 'কল্য বিবি মিলিনের নিকট গমন করিয়া অভিপ্রেত সাধনসম্বন্ধে উপদেশ লইব।' সেদিন রবিবার। সুতরাং প্রাস্কোভিয়া সর্ব্বাগ্রে তত্রত্য ধর্ম্মমন্দিরে গমন করিয়া একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরোপাসনা করিল। উপাসনাকালে তাহার শতগ্রন্থি মলিনবেশ ও একাগ্রচিত্ততা দেখিয়া সেই দেবালয়স্থিত উপাসকগণ তাহার দিকে অনিমিষ নয়নে চাহিয়া রহিল। পরে মন্দির হইতে বিনির্গমন কালে জনৈক রমণী বিনয়পূর্ণ ও প্রণয়গর্ভবচনে প্রাস্কোভিয়াকে আহ্বানপূর্ব্বক তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রাস্কোভিয়া অতীব বিনীতভাবে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসিল "বিবি মিলিন এখানে কোথায় অবস্থান করেন আপনি বলিতে পারেন কি? আমি শুনিয়াছি সেই উদারস্বভাবা রমণী দয়া ও সৌজন্যের অদ্বিতীয় আকরস্বরূপ"। তদুত্তরে ঐ রমণী কহিলেন "বিবি মিলিন নামে মহিলার যে গুণকীর্ত্তন শুনিয়াছ তাহা অতিরঞ্জিত, তুমি আমার সহিত আইস আমি তোমাকে আশ্রয় দিব"। এরূপ কথা প্রাস্কোভিয়ার ভাল লাগিলনা। কিন্তু সেই অপরিচিতা রমণী প্রাস্কোভিয়াকে সমভিব্যাহারে লইয়া বিবি মিলিনের গৃহ দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, যদি তুমি ঐ গৃহে আশ্রয় না পাও তবে আমার নিকট আসিও। এই বলিয়া রমণী সেই গৃহদ্বারের অদূরে দণ্ডায়মান রহিলেন। বলা বাহুল্য এরমণী যে স্বয়ং বিবি মিলিন তাহা

প্রাস্কোভিয়া অনুমাত্র বুঝিতে পারে নাই। প্রাস্কোভিয়া সেই গৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া সম্মুখবর্ত্তি প্রতিহারীকে বিবিমিলিন গৃহে আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিল। প্রতিহারী আপন প্রভুকে অদূরে দণ্ডায়মান দেখিয়া ঈষৎ বিস্মিত হইয়া সেই রমনীর দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিল "ইনিই বিবি মিলিন"। তখন প্রাস্কোভিয়া ক্ষণকাল হতবুদ্ধি হইয়া দণ্ডায়মান রহিল, তাহার মুখ হইতে আর বাক্য নিঃসরণ হইলনা। সেই মহানুভাবা রমণী অবশিষ্ট শীতকাল প্রাস্কোভিয়াকে আপন গৃহে আশ্রয় দিলেন এবং স্বীয় তনয়ার ন্যায় রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। হিমময় কাননপথে নিরাবরণে বহুদিন পরিভ্রমণ করায় প্রাস্কোভিয়ার শরীর শীর্ণ ও নিস্তেজ হইয়া গিয়াছিল। অল্পদিনের মধ্যেই তাহার উৎকট পীড়া উপস্থিত হইল, কিন্তু বিবি মিলিন অনুপম যত্ন ও মমতাসহকারে শুশ্রূষা করায় প্রাস্কোভিয়া অনতিবিলম্বে আরোগ্য লাভ করিল। এইরূপ সুস্থদেহ হইলে বিবি মিলিন তাহার অবস্থোচিত বিদ্যাশিক্ষার আয়োজন করিয়া দিলেন। কাপ্তেন লুপুলফ প্রাস্কোভিয়াকে শৈশবাবস্থায় এমন কোন বিষয়ে শিক্ষাদান করিতেন না যাহাতে তাহাদিগের পূর্ব্বতন সুখসৌভাগ্যের অবস্থা স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া কন্যাকে মর্ম্মবেদনা প্রদান করে। অথবা তিনি নির্ব্বাসন দণ্ড হইতে পুনর্মুক্তি বিষয়ে হতাশ্বাস হইয়া স্বীয় তনয়ার বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেন। আর প্রাস্কোভিয়াও পিতার নির্ব্বাসনদণ্ডের পূর্ব্বাবধি যৎকিঞ্চিৎ বিদ্যা লাভ করিয়াছিল তৎসমুদয় এককালে এতদূর বিস্মৃত হইয়াছিল যে বিবি মিলিনের গৃহে পুনরায় তাহাকে লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষারম্ভ করিতে হইয়াছিল। বস্তুতঃ বিবি মিলিন প্রাস্কোভিয়াকে এতদূর যত্ন ও মমতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে প্রাস্কোভিয়া যখনই বিবিমিলিনের নামোচ্চারণ করিত তখনই তাহার নয়ন হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইত। বিবিমিলিনের সহবাসে প্রাস্কোভিয়া যতই শান্তিসুখ অনুভব করিতে লাগিল ততই সাইবিরিয়ার হিমাচ্ছন্ন অরণ্যানী মধ্যে পিতামাতা দারুণ নির্ব্বাসনযন্ত্রনায় নির্যাতিত হইতেছেন এই অনিবার্য্য দুঃখের কথা তাহাদের হৃদয়ে জাগরূক হইতে লাগিল। প্রাস্কোভিয়া আর থাকিতে পারিলনা। পিতার মুক্তির জন্য আবার গমনোন্মুখী হইল। দুরন্তশীতে বহির্গত হইলে পুনরায় বিপৎপাতের সম্ভাবনা সুতরাং বিবি মিলিন

প্রাস্কোভিয়াকে আরও কতকদিবস আপন গৃহে অবস্থিতি করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। প্রাস্কোভিয়া বিবি মিলিনের বিনয় ও অনুরোধের বশীভূত হইয়া তদীয় গৃহে শীতকাল অতিবাহিত করিয়া বসন্তাগমে সেণ্ট-পিটার্সবর্গাভিমুখে যাত্রা করিল। যাত্রাকালে বিবি মিলিন তাহাকে কয়েকটী মুদ্রা প্রদান করিল।

তৎকালে জনৈক বণিক লবণ ও লৌহ লইয়া নৌকাযোগে ভল্গানদী দিয়া নিজনিনভগরদাভিমুখে যাইবার জন্য প্রস্তুত ছিল। বিবি মিলিন এই ব্যক্তির সহিত প্রাস্কোভিয়ার যাইবার সুবিধা করিয়া দিলেন। জলপথে কয়েক-দিবস যাইতে যাইতে বণিক উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়া জীবলীলা সম্বরণ করিলেন। বণিকের মৃত্যুতে প্রাস্কোভিয়া আবার নিরাশ্রয়া হইয়া পড়িল। একদিবস সন্ধ্যাগমে সহসা ভল্গানদী চতুর্দ্দিক গাঢ় কুজ্ঝটিকায় ব্যাপ্ত হইল এবং ক্ষণপরে প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইল। ঝটিকাবেগে উত্তাল তরঙ্গ উত্থিত হইয়া ভল্গানদী স্ফীতদেহ হইতে লাগিল। ঊর্ম্মিমালার উত্থান পতনে নৌকা ভয়ানক তাড়িত ও বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিল। তাহাতে দুইজন নৌকারোহী ও প্রাস্কোভিয়া জলে পতিত হইয়া নিমগ্ন হইল নাবিকগণ তদ্দর্শনে জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাস্কোভিয়াকে সলিলসমাধি হইতে রক্ষা করিয়া আবার নৌকায় তুলিল। নৌকার কোন স্থান এরূপ আবৃত ছিলনা যে প্রাস্কোভিয়া সেইস্থানে গিয়া আপনার জলসিক্ত গাত্রবস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিধান করে। একবারে লজ্জার মস্তকে পদার্পণ করিয়া নৌকায় প্রকাশ্য-স্থানে আর্দ্রবস্ত্র পরিবর্ত্তন করা নারীজনোচিত কার্য্য নহে এই ভাবিয়া প্রাস্কোভিয়া নৌকাতে আর্দ্রবস্ত্রে দিনাতিপাত করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নৌকা একদিবস সন্ধ্যাকালে নভগরদে উপস্থিত হইল। নাবিকগণ নৌকাবন্ধনপূর্ব্বক প্রাস্কোভিয়াকে এক সেতুর নিকট অবতীর্ণ করিয়া দিল। নৌকা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক আবাসস্থান অন্বেষণ করিবার পূর্ব্বে প্রাস্কোভিয়া উপাসনাকার্য্য সমাধা করিবার জন্য অনতিদূরবর্ত্তী এক দেবালয়ে প্রবেশ করিল। তখন দেবালয়ে একটীমাত্রও লোকছিলনা।

দেবালয়ের পশ্চাৎভাগে এক ধর্ম্মাশ্রম প্রতিষ্ঠিত ছিল। তথায় ধর্ম্মাশ্রম-বাসীগণ সন্ধ্যাকালে ললিত মধুরস্তোত্রপাঠে নিমগ্ন ছিল। সেই তানলয়স্বরসম্বলিত

শ্রবণমধুর কামিনীকণ্ঠরব শ্রবণ করিয়া প্রাস্কোভিয়ার অন্তঃকরণ আশ্বাসিত ও প্রফুল্লিত হইল। প্রাস্কোভিয়া মনে মনে ভাবিল যদি জগদীশ্বর আমার অভিলাষ পূর্ণ করেন আমিও এইরূপ শান্তিরসাস্পদ আশ্রমপদের অধিবাসিনী কৌমার-ব্রহ্মচারিণী হইয়া ভগবদারাধনায় নিমজ্জিত থাকিয়া জীবিতকালের অবশিষ্টভাগ পরমসুখে যাপনকরতঃ আত্মাকে পবিত্র করিব। উপাসনাকার্য্য সমাধা করিয়া সে রজনী প্রাস্কোভিয়া পান্থনিবাসে আশ্রয় লইতে সাহস করিলনা—সুতরাং ধর্ম্মাশ্রমের দ্বারদেশে নীরবে দণ্ডায়মান রহিল। ক্ষণকালপরে একজন ধর্ম্মভগ্নী বহির্গত হইয়া বলিলেন "রাত্রি অধিক হওয়ায় আমাদিগের আশ্রমপদের দ্বাররুদ্ধ করিবার সময় হইয়াছে"। প্রাস্কোভিয়া তদুত্তরে বিনীতবচনে কহিল "আমি নিরাশ্রয়া বালিকা, এগভীর রজনীতে একাকিনী পান্থনিবাসে থাকিতে সাহস করিতেছিনা, অদ্য রজনীতে আপনারা আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পবিত্র আশ্রমে আশ্রয় দিলে পরম চরিতার্থ হইব"। ধর্ম্মভগ্নী কহিলেন "অপূর্ব্বপরিচিত পথিককে আশ্রয় দান আমাদিগের ধর্ম্মাশ্রমের নিয়মাবলীর বহির্ভূত, অতএব তোমাকে এ রজনীতে আমাদিগের আশ্রমে আশ্রয় দিতে পারিবনা; তবে যদি প্রয়োজন হয় আমাদিগের আশ্রমাধ্যক্ষ তোমায় কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করিতে পারেন"। তাহাতে প্রাস্কোভিয়া বিনয়সহকারে অর্থসাহায্যগ্রহণে ঐকান্তিকী অনিচ্ছা প্রদর্শন করিয়া ধর্ম্মভগ্নীকে আপন মুদ্রাধার দেখাইয়া বলিল "এই দেখুন জনৈক বন্ধু আমাকে প্রচুর অর্থ দিয়াছেন এক্ষণে আমার অর্থসাহায্যের প্রয়োজন নাই — আমি নিরাশ্রয়া বালিকা নিরাপদে রজনী যাপন করিবার জন্য কেবল আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি। ধর্ম্মভগ্নী তদীয় বিনয়পূর্ণ কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়া প্রাস্কোভিয়াকে আশ্রমাধ্যক্ষের নিকট লইয়া গেলেন। সেখানে প্রাস্কোভিয়া আপন বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত এরূপ অকপট হৃদয়ে বর্ণিত করিল যে তদীয় পিতৃভক্তির একশেষ দর্শনে ধর্ম্মাশ্রমবাসীগণের হৃদয় দ্রবীভূত হইল এবং আশ্রমাধ্যক্ষমহোদয় কারুণ্যবশতঃ প্রাস্কোভিয়াকে বিশ্রামার্থ আপন শয়নাগারে লইয়া গিয়া প্রার্থিত আশ্রয় প্রদান করিয়া আহারের উদ্যোগ করিয়া দিলেন এবং আশ্রমে কয়েকদিবস অতিবাহিত করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। নভগবে আগমন কালে নৌকায় সিক্তবস্ত্রসংস্পর্শনিবন্ধন উৎকট-

রোগাক্রান্ত হইয়া প্রাস্কোভিয়া আবার শয্যাশায়ী হইল। চিকিৎসকগণ প্রাস্কোভিয়ার জীবিতাশা একরূপ বিসর্জ্জন দিলেন। কিন্তু প্রাস্কোভিয়ার অন্তঃকরণে পুনর্জ্জীবনের আশাপ্রদীপ একেবারে নির্ব্বাপিত হইলনা। আশার আশ্বাসনীশক্তির ইয়ত্তা নাই। প্রাস্কোভিয়া রুগ্নশয্যায় শুইয়া শুইয়াই বলিত "এখনও আমার চরমকাল উপস্থিত হয় নাই; ঈশ্বরানুগ্রহে আমি পিতার মুক্তিরূপ পুণ্যব্রতপালনে সক্ষম হইব"।

সেই রোগে প্রাস্কোভিয়ার শরীর কঙ্কালসার হইয়া গেল। প্রাস্কোভিয়া আরোগ্য লাভ করিতে করিতে সমস্ত গ্রীষ্মকাল কাটিয়া গেল। প্রাস্কোভিয়া আবার পিটার্স্বর্গ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। আশ্রমাধ্যক্ষ প্রাস্কোভিয়ার হস্তে এক খানি পত্র সমর্পন করিয়া তাহাকে স্লেজগাড়ীতে করিয়া এক রমণীর নিকট প্রেরণ করিলেন। সেই রমণী একজন বণিকের তত্ত্বাবধানে প্রাস্কোভিয়াকে পিটার্স্বর্গে প্রেরণ করিলেন এবং সম্রাটসমক্ষে যাইতে ইহার কোনরূপ অসুবিধা না ঘটে তজ্জন্য তত্রত্য জনৈক বর্ষিয়সী রাজতনয়াকে একখানি পত্র লিখিয়া প্রাস্কোভিয়ার হস্তে দিলেন। এইরূপে অবশেষে একমাত্র রৌপ্যমুদ্রা পথের সম্বল করিয়া সেই বালিকা ইশিম হইতে বহির্গমনের দেড়বৎসর পরে সেই সুদীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া অভিপ্রেত প্রদেশ রুষরাজধানী পিটার্স্বর্গে উপনীত হইল। দীর্ঘকাল পরে আজ সেই কাননচারিণীর পরিভ্রমণকার্য্য সমাপ্ত হইল, আজ সেই অষ্টাদশবর্ষীয়া অনুপম অধ্যাবসায়সম্পন্না রুষবালার বাসনা চরিতার্থ হইল।

বণিক পিটার্স্বর্গে উপনীত হইয়া প্রাস্কোভিয়াকে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন; কিন্তু কার্য্যোপলক্ষে অবিলম্বে তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইতে হইল। বণিকের অনুপস্থিতিকালে তদীয় পত্নী যথেষ্ট সৌজন্য ও সমাদর সহকারে প্রাস্কোভিয়ার অতিথি সৎকার করিলেন বটে কিন্তু তাহার অভিলষিত সম্পাদনের জন্য সবিশেষ মনোযোগ রাখেন নাই। বণিকপত্নী একবার সেই বর্ষিয়সী রাজতনয়ার নিকট প্রাস্কোভিয়াকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। রাজতনয়ার গৃহ বণিকের গৃহ হইতে বহুদূরে স্থিত। মধ্যে নেভানদীর ব্যবধান। শীতকালে তুষারপাতবশতঃ নেভানদী অতিক্রম করা কোনও ক্রমে সহজ হইলনা। সুতরাং রাজতনয়ার

নিকট প্রাস্কোভিয়ার যাওয়া হইলনা। একদিবস বণিকের জনৈক বন্ধু বণিকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তাঁহার গৃহে আগমন করিলেন। তিনি প্রাস্কোভিয়ার বৃত্তান্ত সবিশেষ শ্রবণান্তর কহিলেন "এক্ষণে তুমি সবিশেষ সমস্ত বিবরণ লিখিয়া পিতার পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করিয়া সম্রাটের সেনেটসভায় প্রার্থনাপত্র প্রেরণ কর" এই বলিয়া প্রাস্কোভিয়াকে পরামর্শ দিয়া তিনি স্বয়ং প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দিলেন। তদীয় উপদেশ ও পরামর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া প্রাস্কোভিয়া অনবরত পঞ্চদশদিবস ব্যাপিয়া হস্তে প্রার্থনাপত্র ধারণপূর্ব্বক প্রত্যহ সেনেটগৃহের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিত। প্রাস্কোভিয়ার তাদৃশী দশা দেখিয়া কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করিতনা। কেহবা তাহাকে অর্থাভিলাষী-ভিক্ষুক বিবেচনায় দয়া করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থপ্রদানে উদ্যত হইত কেহবা কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া দূর করিয়া দিত।

ক্রমে শ্রীখৃষ্টের জন্মোৎসবকাল উপস্থিত হইল। সেই খৃষ্টীয়ান সাধারণের মহানন্দের সময় প্রতিগৃহ উৎসবপূর্ণ হইল। উৎসবদিবসে প্রাস্কোভিয়া মনের উল্লাসে অত্যন্ত আশান্বিতা হইয়া জগদীশ্বরের আরাধনা করিতে লাগিলেন। এমন কি একদিবস প্রাস্কোভিয়া বণিকপত্নীর সমভিব্যাহারে যানারোহনে গমন করিতে করিতে তাঁহাকে বলিল "পিতার নির্ব্বাসন দণ্ড হইতে উদ্ধার সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ মুক্তসংশয় হইয়াছি; আর একবার সেনেটগৃহের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া চেষ্টা করিলেই সফলপ্রয়াস হইব"। বণিকপত্নী অন্তঃকরণে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন "তোমার অরণ্যে রোদন করা হইতেছে, আমি অতঃপর এই বিষয় লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিবনা"। অদূরে মহাত্মা পিতরের এক লৌহময়ী প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। বণিকপত্নী তাহার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক কহিলেন "সেনেটসমিতিতে প্রার্থনাপত্র প্রেরণ করাও যা আর এই লৌহময়ী প্রতিকৃতির নিকট প্রার্থনাপত্র দেওয়াও তাই"। প্রাস্কোভিয়া কহিল "সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের নিকট সকলই সম্ভব, তিনি ইচ্ছা করিলে এই লৌহময়ী প্রতিকৃতিকেই আমার প্রার্থনাপত্র গ্রহণ করাইতে পারেন"।

এই কথা শ্রবণ করিয়া বণিকপত্নী হাস্য পরিহাস করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে শীতের প্রভাব হ্রাস হইতে লাগিল; আর তুষারপাত দেখা

গেলনা ; নেভানদী পার হইবার আর বিশেষ অসুবিধা রহিলনা। তখন বণিকপত্নী প্রাস্কোভিয়াকে নেভানদীর অপর পার্শ্ববর্ত্তী এক রমণীর নিকট লইয়া গেলেন। তারা উভয়ে ঐ রমণীর গৃহে উপনীত হইলে রমণী দয়া করিয়া প্রাস্কোভিয়ার প্রার্থনাপত্র পাঠ করিয়া বলিলেন যে "প্রার্থনাপত্রটী অতীব অসঙ্গত ভাষায় লিখিত হইয়াছে এবং এই জন্যই কেহ ইহাতে কর্ণপাত করেন নাই। সে যাহা হইক সেনেটসভার একজন প্রসিদ্ধ কর্ম্মচারীর সহিত আমার সন্নিহিত কুটুম্বসম্বন্ধ আছে ; তিনি ইচ্ছা করিলে প্রাস্কোভিয়াকে এবিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিতে পারেন ; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এক্ষণে তাঁহার সহিত আমার বাক্যালাপ নাই।"

কএক দিবস পরে শ্রীখৃষ্টের জন্মোৎসব দিবস উপস্থিত হইল। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের এইরূপ রীতি আছে যে এই শুভদিনে তাহারা স্বজনবান্ধবের গৃহাগমনপূর্ব্বক সাক্ষাৎ ও নমস্কার সম্ভাষণাদি করিয়া থাকে এবং কাহারও সহিত বিবাদ বিসম্বাদ থাকিলেও সেই বিবাদজনিত পরস্পরের মনের সঙ্কীর্ণতা অপসৃত করিয়া সুহৃৎপ্রণয়ে পুনর্মিলিত হইয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। সেই দিবস প্রাস্কোভিয়া সেই রমণীর গৃহে বন্ধুবর্গের সহিত ভোজন করিতে বসিয়াছে এমন সময় সেই আত্মীয় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তদীয় গৃহে উপস্থিত হইল। শীঘ্রই তাঁহার সহিত প্রাস্কোভিয়ার পরিচয় হইল এবং তাঁহাকে প্রাস্কোভিয়াসংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝাইয়া দেওয়া হইল। তিনি বলিলেন সেনেটসভায় প্রার্থনাপত্র প্রেরণ করা হইতেছে বটে কিন্তু তদ্দারা প্রাস্কোভিয়ার উপকারের কোনও প্রত্যাশা নাই। যদিবা পুনর্বিচারের আদেশ হয় তাহা শেষ হইতে কাল বিলম্ব হইবে এবং তাহার ফলও অনিশ্চিত। বরং সম্রাটের দয়ার উপর নির্ভর করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। সম্রাট আলেকজাণ্ডার যেরূপ সাধুশীল ও সরলহৃদয় তাহাতে তাঁহার অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হইলে তিনি সবিশেষ কৃপা প্রদর্শন করিয়া অনায়াসে প্রাস্কোভিয়ার পিতার অপরাধ মার্জ্জনা করিতে পারেন।

প্রাস্কোভিয়া কর্ম্মচারীর বাক্যে সাতিশয় হর্ষিত হইয়া বণিকের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। কএকদিবস পরে বণিক আপন গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক দেখিলেন যে এতাবৎকাল প্রাস্কোভিয়ার হিতসাধনে সম্পূর্ণ আলস্য ও ঔদাস্য

প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং তিনি গৃহে আসিয়া কালবিলম্ব না করিয়া প্রাস্কোভিয়াসমভিব্যাহারে রাজতনয়ার গৃহে উপস্থিত হইলেন। রাজতনয়া তাহাদিগকে দেখিয়া আগমন প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলে প্রাস্কোভিয়া প্রণিপাত-পূর্ব্বক অতি বিনয়সহকারে তদীয় হস্তে পত্রখানি সমর্পন করিল। সেই বর্ষিয়সী রাজতনয়া পাঠানন্তর বণিকমুখে প্রাস্কোভিয়ার বিবরণ সবিশেষ শ্রবণ-করতঃ তদীয় অনির্ব্বচনীয় পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দর্শনে যৎপরোনাস্তি মুগ্ধ ও আর্দ্র হইলেন এবং সত্বর বিশ্রাম ও আহারাদি সমাধানের আদেশ করিলেন। সে দিবস রাজতনয়া অনেকগুলি সম্ভ্রান্তব্যক্তিকে আপন গৃহে নিমন্ত্রন করিয়াছিলেন; সে দিবস তাঁহার গৃহে সমারোহের সীমা ছিলনা, নানা বিধ ক্রীড়া কৌতুকে তাঁহার গৃহ আনন্দময় ও উৎসবপূর্ণ হইয়াছিল। সে দিবস রাজনন্দিনী স্বয়ং নিমন্ত্রিতবর্গের পরিচর্য্যায় ব্যাপৃতা ছিলেন সুতরাং প্রাস্কোভিয়ার দিকে মনঃসংযোগের অবকাশ পান নাই। এইরূপে অভীষ্টসিদ্ধি-বিষয়ে কালবিলম্ব হইতে দেখিয়া প্রাস্কোভিয়া নিতান্ত হতোৎসাহ হইয়া পড়িল। অভিলষিত লাভের যাবতীয় পথ নিরাশার ঘোরান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইতেছে দেখিয়া ভাবিল আমি কি মৃগতৃষ্ণিকায় ভ্রান্ত হইয়া অনর্থক আপনাকে ক্লেশ দিতে উদ্যত হইয়াছি? যাহাহউক নিমন্ত্রিতবর্গের ভোজনসমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া দেখি। কিয়ৎক্ষণ পরে নিমন্ত্রিতবর্গের আহারাদি সমাপন হইলে রাজতনয়া প্রাস্কোভিয়ার হস্তে রুষিয়ার সম্রাটমাতার প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট একখানি অনুরোধপত্র দিলেন। প্রাস্কোভিয়া ঐ পত্র লইয়া কর্ম্মচারীর গৃহে গমন করিল। কর্ম্মচারী পূর্ব্বহইতেই প্রাস্কোভিয়ার বিষয় কিঞ্চিৎ অবগত ছিলেন এবং নিতান্ত নিঃস্ব ও দুরাবস্থাগ্রস্ত মনে করিয়া প্রাস্কোভিয়াকে দিবার জন্য গৃহে কএকটী রৌপ্যমুদ্রা রাখিয়া, কার্য্যবিশেষে দূরদেশে গমন করিয়াছিলেন। তদীয় পত্নী প্রাস্কোভিয়ার অলৌকিক অধ্যাবসায়বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে আপনগৃহে প্রাস্কোভিয়াকে অবস্থিতি করিতে বলিলেন। কর্ম্মচারী গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পত্নীর নিকট প্রাস্কোভিয়ার বিবরণ সবিশেষ শ্রবণান্তর অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সম্রাটমাতার নিকট গমন পূর্ব্বক প্রাস্কোভিয়ার প্রার্থনা নিবেদন করিলেন। সম্রাটমাতা অত্যন্ত মহানুভাবা

ও উদারস্বভাবা ছিলেন। তিনি প্রাস্কোভিয়ার বৃত্তান্ত সমুদয় শ্রবণ করিয়া আদেশ করিলেন অদ্যই অপরাহ্নসময়ে ইহারে সম্রাটপত্নীসমীপে প্রেরণ করিতে হইবে। এইরূপে আশাতরু সহসা ফলবান হইতে দেখিয়া প্রাস্কোভিয়ার নয়নযুগল আনন্দাশ্রুপরিপ্লুত হইল। প্রাস্কোভিয়া তখন কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল "জগদীশ্বর, আমি তোমার উপর অনর্থক বিশ্বাস স্থাপন করি নাই"। অনন্তর ভক্তিভরে সম্রাটমাতার হস্তচুম্বন করতঃ কহিল "আপনি অসামান্য অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমার পিতার উদ্ধার-কার্য্যের সহায়তা করিলেন এজন্য আপনার নিকট আমি চিরক্রীত রহিলাম"।

পিতার মুক্তিচিন্তাই প্রাস্কোভিয়ার মানসরাজ্যকে এতদূর অধিকার করিয়াছিল যে তাহার অন্যান্য সমস্ত চিন্তা দূরীভূত হইয়া গেল; তাহার অন্তঃকরণ পিতার উদ্ধারসাধনকার্য্যে এতই পরিপূর্ণ থাকিত যে অঙ্গসৌষ্ঠব, পরিচ্ছেদপারিপাট্য অথবা শিষ্টাচার পরম্পরা সমাধান বিষয়ে দৃক্‌পাতও করিত না। অবশেষে অবধারিত সময়ে সম্রাটমাতা স্বয়ং তাহার কেশসংযত করিয়া দিয়া, বিনীতবেশে স্বকীয় কর্ম্মচারীসমভিব্যাহারে প্রাস্কোভিয়াকে সম্রাটপত্নীর নিকট প্রেরণ করিলেন। প্রাস্কোভিয়া অদূরে রাজপ্রাসাদ দেখিয়া কহিতে লাগিল "আহা আজ আমার কি শুভদিন, আজ রাজপ্রাসাদ প্রত্যক্ষ করিলাম, যদি পিতা আজ আমাকে এখানে দেখিতেন তাহা হইলে তিনি কতই আনন্দিত হইতেন—জগদীশ্বর তুমি তোমার কার্য্য সমাধা করিলে।" পরে সাধুশীলা সম্রাটপত্নী প্রাস্কোভিয়াকে একাকিনী এক নির্জ্জন কক্ষে আনয়নকরতঃ সমুচিত প্রদেশে আসন প্রদান করিলেন। প্রাস্কোভিয়া আসনে উপবেশন পূর্ব্বক আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ কহিয়া আপন অভিপ্রায় নিবেদন করিল। সম্রাটপত্নী অভিনিবেশ পূর্ব্বক তৎসমুদয় শ্রবণান্তর প্রাস্কোভিয়ার পিতৃভক্তির ও আত্মজীবনোৎসর্গের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কহিলেন "আমি অঙ্গীকার করিতেছি তোমার বিষয় সম্রাটকে জানাইব"। এই বলিয়া ৩০০ শত রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করিয়া প্রাস্কোভিয়াকে বিদায় দিলেন। প্রাস্কোভিয়াও তাঁহার সদাশয়তায় পূর্ণহৃদয় হইয়া দরবিগলিতধারে হর্ষবাষ্প বিসর্জ্জন করিতে করিতে প্রতিগমন করিল। দুইদিবস পরে পুনরায় সম্রাটমাতা স্বয়ং প্রাস্কোভিয়াকে সম্রাট ও সম্রাটপত্নীর নিকট লইয়া গেলেন। তাঁহারা

উভয়ে প্রাস্কোভিয়াকে আপন প্রকোষ্ঠে আনয়ন পূর্ব্বক পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। পরে, অচিরে তাহার পিতার পুনর্বিচার হইবে এই অঙ্গীকার করিয়া ৫০০০ মুদ্রা প্রদান করতঃ প্রাস্কোভিয়াকে বিদায় দিলেন।

প্রাস্কোভিয়াসংক্রান্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত অল্পদিনমধ্যেই সর্ব্বতঃ সঞ্চারিত হইল। যাঁহারা পূর্ব্বে তাহার দিকে দৃকপাতও করিতেন না এক্ষণে তাঁহারাও তাহার হিতসাধন পক্ষে যত্ন ও আগ্রহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; বস্তুতঃ কি প্রধান কি নিকৃষ্ট, কি ধনী কি দরিদ্র সকলেই নিতান্ত উৎসুক-চিত্তে প্রাস্কোভিয়ার কথা লইয়া আন্দোলন ও কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কেহ বা তাহাকে দেখিয়া কহিতে লাগিলেন যে প্রাস্কোভিয়াসম্বন্ধে যে সকল গুণকীর্ত্তিত হইতেছে তাহা সেই সুলক্ষণার আকারেই স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। ফলতঃ আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই একবাক্যে প্রাস্কোভিয়ার প্রশংসাগীতি গাহিয়া তাহাকে শতগুণে মহীয়সী করিয়া তুলিলেন। কিন্তু প্রাস্কোভিয়া এই আত্মপ্রশংসাবাদে অনুমাত্র গর্ব্বিত বা রেখামাত্র বিচলিত হইলনা। একদিবস দুইটী রমণী প্রাস্কোভিয়াকে সুসজ্জিত রাজপ্রাসাদ দেখাই-বার জন্য লইয়া গেলেন। প্রাস্কোভিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া মণিমণ্ডিত রাজসিংহাসন দর্শনমাত্র অন্তঃকরণে অতিমাত্র চমৎকৃত হইয়া বলিল "ইহাই কি রাজসিংহাসন? সাইবিরিয়ায় অবস্থানকালে ইহাকেই এত ভয় করিতাম?" এই বলিতে বলিতে তাহার পূর্ব্বতন বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে জাগরূক হইয়া হত-চৈতন্যপ্রায় হইয়া পড়িল। কএক মুহূর্ত্ত পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া সম্মানসূচক পদবিক্ষেপে মৃদুভাবে দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া সেই বিচিত্ররচনা সিংহাসনাধি-রোহণীর পাদদেশ চুম্বন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন "পিতঃ আজ কি আহ্লাদের দিন, দেখুন সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর আমাকে কোথায় আনিয়াছেন; এতদিনে আমি নয়নের চরিতার্থতা লাভ করিলাম; যিনি এই রত্নসিংহাসনে আসীন হইয়া মূর্ত্তিমান ধর্ম্মের ন্যায় স্থির চিত্তে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করেন, আমি সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের নিকট কায়-মনোবাক্যে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থনা করিতেছি"। প্রাস্কোভিয়া মানসিক চিন্তাপ্রভাবে এতদূর দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে সেদিন আর রাজ-প্রাসাদের অধিক কিছু দেখা হইলনা।

সাইবিরিয়া হইতে বহির্গমনকালে প্রাস্কোভিয়া অন্য দুইটী নির্ব্বাসিতব্যক্তির নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিল কার্য্যকালে সেই প্রতিশ্রুতি পালনে বিস্মৃত হয় নাই। প্রাস্কোভিয়া প্রতিজনের নিকট তাহাদিগের নামোল্লেখ করিত। কিন্তু তাহার পিতার উদ্ধার কার্য্যে বিঘ্ন হইতে পারে এই বলিয়া সকলেই তাহাকে তাহাদিগের কথা উল্লেখ করিতে নিষেধ করিতেন। কিয়দ্দিবস পরে প্রাস্কোভিয়া সংবাদ পাইল যে সম্রাট তাহার অদ্ভুত সাহস, অনুপম অধ্যবসায় ও নিরতিশয় পিতৃভক্তি দর্শনে প্রসন্ন ও চমৎকৃত হইয়া তাহার পিতার অপরাধ মর্জ্জনা করিয়া নির্ব্বাসনদণ্ড হইতে মুক্তির আদেশ দিয়াছেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছেন প্রাস্কোভিয়ার আর কোন প্রার্থয়িতব্য আছে কি না, প্রাস্কোভিয়ার অভিপ্রায় অবগত হইলে তিনি তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন। প্রাস্কোভিয়া জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়া কহিল "সম্রাট যদি দয়া করিয়া পিতার ন্যায় ঐ দুইটী নির্ব্বাসিতব্যক্তির অপরাধ মার্জ্জনা করেন তাহা হইলে আমি চরিতার্থ হই"। সম্রাট সেই সুধীরা বালিকার এইরূপ প্রবীণতা ও পরার্থপরতা দর্শনে বিস্মিত হইলেন এবং সেই সমস্ত অসাধারণ গুণের পুরস্কার স্বরূপ দুইটী নির্ব্বাসিতব্যক্তিকেও ক্ষমা করিলেন। আজ কি সৌভাগ্যের দিন। অশেষবিধ বিপত্তির সহিত সংগ্রামের পর অদ্য সেই রুষবালা দুস্তর পথপর্য্যটনের চরমসীমায় উপনীত হইল। অদ্য তাহার পিতার নির্ব্বাসনমুক্তির সমুদয় চিন্তার অবসান হইল।

প্রাস্কোভিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছিল অতঃপর কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বন করিয়া আত্মজীবনোৎসর্গ করিব, ধর্ম্মচিন্তায় ঐহিক জীবনের চরমসীমায় উপনীত হইব; পিতার মুক্তিপ্রাপ্তির জন্য জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিবার ইহাই প্রশস্ত পথ। পিটার্সবর্গে আগমনকালে পীড়িতাবস্থায় নিজ্‌নির যে ধর্ম্মাশ্রমে ধর্ম্মভগ্নীগণ সহোদরানির্ব্বিশেষে প্রাস্কোভিয়ার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন সেই নিজনির ধর্ম্মাশ্রমের দিকে প্রাস্কোভিয়ার অন্তঃকরণ ক্রমশই আকৃষ্ট হইতে লাগিল। প্রাস্কোভিয়া অতঃপর তীর্থপর্য্যটনমানসে কীফনগরে গমন করিল। কীফনগর রুষদিগের পরম পবিত্র স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেখানে অনেক সাধুর সমাধিস্থান আছে। প্রাস্কোভিয়া কীফনগরে গমন পূর্ব্বক সংসারাশ্রম বিসর্জ্জন দিয়া পিতার অপরিজ্ঞাতরূপে ধর্ম্মাশ্রমে প্রবিষ্ট হইল। পিতামাতার

প্রতি প্রাস্কোভিয়ার যেরূপ অবিচলিত স্নেহ ও ঐকান্তিকী ভক্তি ছিল এপর্য্যন্ত তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই, কিন্তু পিতামাতর সম্মতি না লইয়া ধর্ম্মাশ্রমে প্রবিষ্ট হওয়া অনেকের পক্ষে বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া বোধ হইত পারে। বিপত্তিকালে প্রাস্কোভিয়ার মুখ হইতে যে বিষম প্রতিজ্ঞাবাক্য নিঃসৃত হইয়াছিল প্রতিজ্ঞাপালনতৎপর প্রাস্কোভিয়া আজ সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিল। নিজনিতে পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে এই আশায় প্রাস্কোভিয়া কীফনগর হইতে নিজ্‌নি প্রত্যাগমন করিল। প্রাস্কোভিয়া নিজ্‌নিতে উপস্থিত হইয়া ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে প্রধান ধর্ম্মভগ্নীর নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল সাইবিরিয়া হইতে পিতার প্রত্যাগমন সংবাদ আসিয়াছে কি না। ধর্ম্মভগ্নী কহিলেন "আমার গৃহ মধ্যে চল সেখানে বসিয়া তোমার পিতামাতার শুভসংবাদ দিব"। প্রাস্কোভিয়া নির্ব্বাক হইয়া তাহার অনুবর্ত্তিনী হইল। প্রাস্কোভিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই পিতামাতাকে দেখিতে পাইল। তাঁহারা উভয়ে বহুকালপরে কন্যাকে দেখিয়াই জানুপাতনপূর্ব্বক কন্যার সমক্ষে ক্ষণকাল দণ্ডায়মান রহিলেন। প্রাস্কোভিয়া তদ্দর্শনে দৃঢ়বন্ধনে তাঁহাদিগের চরণ ধরিয়া অনুচ্চস্বরে কহিল "আপনারা কি করিতেছেন, আপনারা যে নির্ব্বাসনদণ্ড হইতে মুক্ত হইয়াছেন তজ্জন্য জগদীশ্বরকে শতশত ধন্যবাদ দিন।" এই বলিতে বলিতে প্রাস্কোভিয়ার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। পিতা তখন অপ্রমেয় বাৎসল্যভরে নিস্পন্দনয়নে কন্যাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; মাতা স্নেহভরে বারংবার তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা উভয়েই নিরতিশয় স্নেহভরে প্রাস্কোভিয়াকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করতঃ প্রবলবেগে বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। নিজ্‌নিতে প্রাস্কোভিয়া পিতামাতার সহবাসে সপ্তাহকাল পরম সুখে অতিবাহিত করিল। সম্রাটের আদেশ বশতঃ কাপ্তেন লুপুলফকে শীঘ্রই সস্ত্রীক পিটার্সবর্গাভিমুখে যাইতে হইল। রাজধানীতে প্রতিগমন করিয়া কাপ্তেন লুপুলফ পুনরায় রাজপ্রসাদলাভ পূর্ব্বক পূর্ব্বতনপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

নিজ্‌নিনভগরদে প্রাস্কোভিয়া পুনরায় পীড়াগ্রস্ত হইল। সাইবিরিয়া হইতে পিটার্সবর্গাগমনকালে নিরাবরণে দুরন্তশীতে দুর্গম কাননপথপর্য্যটনে, যথাসময়ে অন্নপানবিরহে প্রাস্কোভিয়া যে সমস্ত ক্লেশ অনুভব করিয়াছিল

তাহাতে তাহার শরীর নিতান্ত শীর্ণ ও নিস্তেজ হইয়া গিয়াছিল। তাহাতে আবার উৎকট পীড়াগ্রস্ত হইয়া তাহার কলেবর চর্ম্মাবৃত কঙ্কালমাত্রে পর্য্যবসিত হইল, এজন্মে আর সুস্থদেহ হইতে পারিলনা। শরীর দিন দিন যে রূপ ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল তাহাতে আর অধিক দিন বাঁচিবনা এই আশঙ্কা করিয়া প্রাস্কোভিয়া পুনরায় পিটার্স বর্গে গমন পূর্ব্বক পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিল।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর তারিখে সহসা প্রাস্কোভিয়ার পীড়ার অবসান হইল। সে দিন প্রত্যুষে ধর্ম্মাশ্রমের দেবালয়ে এক পল্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া প্রাস্কোভিয়া নীরবে ঈশ্বরোপাসনা করিতে লাগিল। ধর্ম্মভগ্নীগণ দেখিলেন এক্ষণে প্রাস্কোভিয়ার বিশ্রামসুখলাভ আবশ্যক। সুতরাং একজন-মাত্র প্রাস্কোভিয়ার শুশ্রূষার জন্য নিয়োজিতা রহিলেন এবং অবশিষ্ট সকলে চলিয়া গেলেন। ইনি পল্যঙ্কের শিখরদেশে আসীন হইয়া মনের অনুরাগে ললিতমধুর স্বরে মঙ্গলগীতি গাইতেছিলেন, ইহাতে প্রাস্কোভিয়ার নীরব উপাসনার ব্যাঘাত হইতে লাগিল। তখন প্রাস্কোভিয়া কহিল " ভগ্নী ! সঙ্গীত ক্রিয়া স্থগিত রাখিয়া ধর্ম্মগ্রন্থের স্তবাবলী আবৃত্তিমাত্র করিয়া আমার হৃদয়ের শান্তি সম্পাদন কর "। তখন প্রাস্কোভিয়ার অন্তিমকাল উপস্থিত। আসন্ন-কালে প্রাস্কোভিয়ার প্রসন্নচিত্তের কিছুমাত্র ব্যত্যয় ঘটিলনা ; মৃত্যুযাতনা তাহার প্রীতিময় মুখশ্রীকে বিশীর্ণ করিতে পারে নাই। সুতরাং কোন বিপদের আশঙ্কা নাই; এই ভাবিয়া ধর্ম্মভগ্নীগণ দিবাবসানে নিঃশঙ্কচিত্তে প্রাস্কোভিয়াকে একাকিনী রাখিয়া গেলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন প্রাস্কোভিয়া শয্যাগত হইয়া করযোড়ে অনন্তনিদ্রার ভজনা করিতেছে।

শ্রীকমলকৃষ্ণ সাহা।

কবিতাগুচ্ছ।

স্নেহে নির্ব্বাণ।

রেণু কণিকার মত পড়েছিনু এক ধারে
মুখপানে চেয়ে সদা একটু স্নেহের তরে,
নিশিদিন কত লোক চেয়ে মোরে চলে যেত
একটি স্নেহের কথা কভু [illegible] দেয়নি ত ;
প্রাণের সে আকুলতা, মরমের দীর্ঘশ্বাস
মুহূর্ত্তেক পশে নাই তাদের মরম পাশ,
ভেবেছিনু এ ধরণী গড়া নিরমমতায়
সরল স্নেহের নদী হেথা বুঝি নাহি বয়।
কোথা হতে একটি যে সুস্নিগ্ধ স্নেহের ধারা
বহিয়া আসিতেছিল প্লাবিয়া সকল ধরা,
সেই স্নেহসুধা স্রোতে ভেসে গেল, সমুদায়
আমারেও তারি সাথে ভাসাইয়া নিল হায়।
জানিনাক তারপর কোথায় আসিনু ভেসে
কাহার যে স্নেহবুকে ঘুমায়ে পড়িনু শেষে॥

শ্রীমতী সরযূবালা দত্ত

ভাগ্যদেবীর প্রতি।

অয়ি ভাগ্যদেবি! বিচিত্র শকতি ময়ি,
বিচিত্র মায়াকুশলে, ছলনারঙ্গিনি,
চাহিবেনা মুখ তুলে,' কালভুজঙ্গিনী
হ'য়ে দংশিবে সতত? সঙ্গোপনে রয়ি'
নিয়ত খেলিবে ক্রূরে অরুন্তুদ খেলা?
হায় স্বেচ্ছাচরিণি, পূজা আরাধনে
কর মানবের অনাদর অবহেলা;
ভিখারীও কভু স্বতঃ ও বাহুবন্ধনে
আসে তব; কখন বা রাজরাজেশ্বর
পথের ভিখারী হয় তোমার কৌশলে!
তোমার আলেয়া আলো অবিরত জ্বলে
অভাগা আমার! কোন্ অন্ধ দুরান্তর,
কোন্ দৈত্যশ্মশান হীনভাগ্যফলে
হ'বে পরিণামে মোর, অয়ি অসরলে!

শ্রীপ্রিয়নাথ ঘোষাল।

কোকিল। *

বসন্তের প্রিয় পাখি,
কবিদের প্রাণ সখি,
গাছের আড়ালে থাকি,
কুহু কুহু রবে সদা মাতাও পরাণে।

---

* ওয়র্ড্স্ওয়ার্থএর "টু দি কাকু" অবলম্বনে লিখিত।

কিরূপে বলিব পাখি ?
যেদিকে ফিরাই আঁখি,
কখন চোখে না দেখি,
শুনি মাত্র ধ্বনি তব অনন্ত গগনে।

যদিও ও রব শুনে,
অর্থ শুন্য হয় মনে,
তবু সদা কেমন, ইচ্ছা হয় শ্রবণে।

তাতে যে কি আছে সুধা,
কখনো না মেটে ক্ষুধা,
যতই শুনিনা কেন বসন্ত পবনে।

শুনিলে তোমার বুলি,
শৈশবের দিন গুলি,
একে একে আসে সব আমার স্মরণে।

এবে সব মনে পড়ে,
ভ্রমিতাম তোমা তরে,
শতদিকে ঘুরে ফিরে কাননে কাননে।

তোমায় তবু না পেয়ে,
আশায় হতাশ হোয়ে,
শুনিতাম কুহু মাত্র অতি সযতনে।

তথাপি সে ভালবাসা,
তোমারে শ্রবণ আশা,
কখন যাবেনা মোর এ মর জীবনে।

উদিত অতীত কথা,
পাইতাম কত ব্যথা,
মনে হ'ত হারায়েছি অমূল্য রতনে।

স্বপ্নময় এ সংসার,
নাহিক কিছুই সার,
মনে হয় শুনে সদা তোমার কূজনে।

স্বপ্নরাজ্য ছায়া সম,
অনন্ত গগনে ভ্রম,
উপযুক্ত স্থান তব না হয় কাননে।

শ্রীমতী শশিপ্রভা শেঠ।

এককোণে।

এই জগতের কোণে, নীরবে বিজনে
জুড়া'তে এসেছি হৃদি-ভার,
তাই আপনার মনে ভ্রমি আনমনে,
জন হীন পথে অনিবার।

সদা উছসিত হিয়ে, নীরবতা দিয়ে
চ'লে যাই, নিয়ে কত ছবি ;
উদে যেন ধীরে ধীরে, হৃদয়-সমীরে,
প্রভাত শিশিরে নব রবি।

প্রাণ কাঁদিলে গো নিতি, উছসিলে স্মৃতি,
বাড়ে যদি ব্যথা বেদনার,
ওগো, সে প্রকৃতি রাণী যতনেমু'খানি
মুছান আঁচলে আপনার।

হেরি, সংসার সুদূরে, বেদনার সুরে
বহে যবে শোক-গীত মোর,
বসি, প্রকৃতির কোলে, সমীরের বোলে,
হৃদয়-হিলোলে হই ভোর!

দূরে, "সর্ সর্" স্বর, প্রাণ-প্রিয়তর
স্বরগ-মাধুরী ঢেলে যায়,
ল'য়ে বন-ফুল-বাসে, সমীর বিলাসে,
পলে ধীরে ভাসে, পলে ধায়।

ওগো, সে বায়ু পরশি,' লতিকা রূপসি
শিহরি,' লুটায় তরু-বুকে,
তায় হেরি' ধীরে অতি, কুহরে কপোতী'
প্রণয়-বারতা কহে সুখে।

বসি,' এই এক কোণে আপনার মনে
পরি'.গলে কত প্রীতি-মালা,
ওগো, বড় সাধ মোর, মুছি আঁখি-লোর,
ভুলি, শোক—সংসারের জ্বালা!

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী।

তানসেনের সাধনা।

এ সংসারে কোন কার্য্যই কারণ ব্যতীত সম্পন্ন হয়না। কারণ কার্য্যের অন্তরে নিগূঢ়রূপে বিরাজ করে। কারণটী অন্তর্বস্তু, কার্য্যটী বহির্বিষয়। আমাদের কার্য্য বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে, কিন্তু তাহার কারণ আমদের অন্তরে বিদ্যমান থাকে। আমাদের অন্তরস্থ এই কারণই আমাদের সাধ বা ইচ্ছা। অন্তরে সাধ থাকিলে তবে সাধন করা যায়। যাহার ইচ্ছা নাই তাহার পক্ষে সাধন বিড়ম্বনা, সেই জন্য সাধনের জন্য আমাদিগের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য মনের ইচ্ছাকে ভালরূপে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করা। সর্ব্বাপেক্ষা অকৃত্রিম উপায়ে এই সাধকে যে ফুটাইতে পারে তাহা আমার বিবেচনায় সঙ্গীত। আমাদের স্বভাবে স্বাভাবিক বিচিত্র নিয়মের বলেই সাধ বা ইচ্ছা অষ্ট প্রহর জাগ্রত হইতেছে, পুষ্ট হইতেছে, কিন্তু পুনরায় তাহা আমাদের নিজ দোষে বিকৃত হইয়া ম্রিয়মান হইয়া পড়ে, তখন আমরা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ি, সকল বিষয়েই যেন অরুচি প্রকাশ পায় যেন নির্জীব হইয়া পড়ি। তৎকালে এই নির্জীব ভাবে জীবন দান করিতে সঙ্গীতের তুল্য উপায় নাই বলিলেও হয়। সঙ্গীতের ইঙ্গিত মাত্রেই আমরা কার্য্যসাধনে জীবন্তমূর্ত্তি ধারণ করি। কার্য্য-সাধনে সঙ্গীতের ক্ষমতার জ্বলন্ত নিদর্শনসমূহ ইতিহাসে ভূরি ভূরি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাহইলে, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে সাধনের ক্ষেত্রে সঙ্গীত সকল উপায়ের অপেক্ষা অকৃত্রিম স্বাভাবিক ও সরস। ইহার সাহায্যে প্রাণ সরসভাবে কার্য্যসাধন করিতে সমর্থ হয়। সেই 'রসো বৈ সঃ' সেই সকল রসের আধার যে পরমেশ্বর তাঁহাকে সঙ্গীতের সরস উপায়ে যেমন সহজে সাধন করিতে পারা যায় এমন আর কিসে? এই জগতে এ হৃদয় সাধকের প্রাণে যখনি চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখে তখনি তাহাতে সঙ্গীতের সূক্ষ্ম অনাহত ধ্বনি না ধ্বনিত হইয়া যায় না। সঙ্গীতের এই অনা-

হতধ্বনি যোগের মহিমা ধ্বনিত করে, ইহা যোগ সাধনে কম সহায়তা করে না। সাধক তানসেন সেই রসস্বরূপের সঙ্গে যোগ-সাধনে সঙ্গীতের সরস শক্তি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি প্রধানতঃ সঙ্গীতের সহায়তায় যোগসাধন করিতেন। সাধনায় তিনি সঙ্গীতকে প্রধান উপায় বলিয়া জীবনে গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি যোগসাধনের জন্য সঙ্গীত সাধনা করিয়াছিলেন। যোগসাধন করিতে গেলে বিপথগামী ইন্দ্রিয়াদি আপনার ইচ্ছার অধীনে নিয়মিত করিয়া, তাহাকে বশে আনিয়া তাহাদিগকে স্বেচ্ছাচারিতার পথ হইতে ফিরাইয়া লইয়া স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করিয়া দিতে হয়; এই বশীকরণে ও মুক্তিআনয়নে সঙ্গীত কম উপযোগী নয়। সঙ্গীত এই বশীকরণে ও স্বাধীনতানয়নে সমর্থ বলিয়া যোগীহৃদয়ে ইহা বিশেষ উপযোগী। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য যোগে সঙ্গীতের আবশ্যকতা ও উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ছিলেন। সঙ্গীতে যোগযুক্ত হইয়া সহজে আনন্দরসের সঙ্গে মোক্ষ লাভ করা যায়। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন "গীতজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন ভক্তিং মুক্তিঞ্চ বিন্দতে"। গীতজ্ঞ ব্যক্তি অপ্রয়াসে ভুক্তি এবং মুক্তি লাভ করে। সঙ্গীত মানব আত্মার আদি রসময়ী-ভাষা। অনন্তের ভাবে যোগযুক্ত হইবার সময় এই আদি ভাষা বড় কার্য্যকারী। এই আদিভাষায় মানব সেই অসীমে প্রাণ মন উন্মুক্ত করে। এই আদি ভাষা ভাষার অন্যান্য বিভাগ হইতে এক পৃথক পদার্থ।

Max Muller বলেন—"True it is, music gives us a new life, and to be without that life is the same as to be blind. * * Music is the language of the soul, but it defies interpretation. It means something, but that something belongs not to this world of sense and logic, but to another world quite real, though beyond all definition. How different music is from all other arts. ....

তানসেন সঙ্গীতের মর্য্যাদা ও তাহার যথার্থ অকৃত্রিম প্রাণ অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তাই তাঁহার গানে আমরা এক সরল ছবি দেখিতে পাই; তাঁহার গানের রচনায় প্রায় যেন এক অকৃত্রিম সাধনের চিত্র প্রতিভাত দেখা যায়। তাঁহার রচিত ধ্রুপদের বাণী অর্থাৎ রীতিতে

এক প্রথম—সহজ আদিভাব বিদ্যমান দেখা যায়। আভীরবালকেরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গীতের যে সরল আদি-রসের আনন্দে মাতিয়াছিল তাহারই ছায়া যেন তানসেনের গানে! কৈলাসে হরপার্ব্বতীর প্রথম গীতরসের সহজাবস্থা যেন তানসেনের গানে। তানসেনের এই সহজ স্বাভাবিক ভাবের জন্যই বোধ হয় তিনি হিন্দু মুসলমানের সকলেরই আদরের পাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তানসেনের বাণীকে তাই গায়কেরা শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করেন। সঙ্গীতে ধ্রুপদে চারি প্রকার বাণী আছে, তন্মধ্যে তানসেনের বাণীকেই গৌহার নামক রাজবাণী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বাণী,—প্রথম বাণী বলিয়া ভারতসঙ্গীতজ্ঞেরা সম্মানিত করেন। সঙ্গীতে তাঁহার বাণীর প্রথম আসন বা সিংহাসন লাভ করা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কারণ তাঁহার গানের ভাব রচনারীতি দেখিলেই বুঝা যায় যে সঙ্গীতের মধ্যে তিনি যেন সতত জগতের আদি বাণী সেই নিরবয়ব আদি শব্দকে "প্রথম মান ওঙ্কার" অর্থাৎ প্রথম অর্থ ওঙ্কারকেই প্রাণের সহিত অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাঁহার গীত আলোচনা করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে ওঙ্কার প্রণবই তাঁহার হৃদয়ের প্রথম বাণী তাঁহার সাধনের প্রথম মন্ত্র ছিল। সেই মন্ত্রে তিনি আপনার অন্তরের সমুদয় ভাবকে শিক্ষিত ও দীক্ষিত করিতেন। তিনি বস্তুতঃ সঙ্গীতের সাহায্যে সেই এক অদ্বিতীয় নিত্য শব্দের সাধনা করিতেন। এই সূক্ষ্মভাব নিত্য শব্দকে স্ফোট বলে। যাঁহার অন্তরে নিত্যশব্দ সতত বিরাজ করে তাঁহার সকল শব্দ সহজায়ত্ত হয়। তাঁহার বাকবাণী স্ফুটতা লাভ করে। এই স্ফোটাখ্য নিরবয়ব নিত্য শব্দই ব্রহ্ম।"

"স্ফোটাখ্যো নিরবয়বো নিত্যশব্দো ব্রহ্মৈবেতি।"

এই অবিনাশী নিত্যশব্দ ব্রহ্মের মহিমাগানের জন্য তানসেনের চিত্ত সর্ব্বদা যেন উদ্বেলিত হইয়া উঠিত।

এই নিত্যশব্দের জ্ঞান যাঁহার মনে সদা স্ফূর্ত্তি পায় তিনি ধন্য। এ জ্ঞানের জন্য তৃষা চাই আকাঙ্ক্ষা চাই—বিশেষরূপ সাধনা চাই। এই জ্ঞান বা জ্ঞানস্বরূপকে জানিতে গিয়া মনের সহিত বাক্য প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু সাধনের বলে অন্তরে সেই শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ স্বয়ং আসিয়া প্রকাশিত হয়েন।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
সাধনাদমলং জ্ঞানং স্বয়ং স্ফুরতে তদধ্রুবম্॥"

তানসেনের অমল জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, বলিয়াই সেই বিশুদ্ধ জ্ঞানবলে পুরাণ ও কোরাণ সকলেতেই তানসেন ঈশ্বরের সমান ভাব দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অৎ৭৮ স্বজাতীয় বা বিজাতীয় সকল ধর্ম্মশাস্ত্রকেই শাস্ত্ররূপে জ্ঞান করিতেন। তিনি জ্ঞানলাভের জন্য কি হিন্দু কি মুসলমান সকলকেই গুরুপদে বরিত করিতে কুণ্ঠিত হইতেননা। তন্ত্রে আছে 'সর্ব্বেষাং ভুবনে সত্যং জ্ঞানায় গুরুরেবহি।" ইহা সর্ব্বভুবনে সত্য যে জ্ঞানের জন্যই গুরু। ভগবান শিব পার্ব্বতীকে কহিতেছেন 'জ্ঞানান্মোক্ষ বাপ্নোতি তস্মাজ্ জ্ঞানং পরাৎপরং। অতোযো জ্ঞানদানে হি ন ক্ষমেত্তং ত্যজেদ্ গুরুং। অন্নাকাঙ্ক্ষী নিরন্নং হি যথা সংত্যজতি প্রিয়ে॥' উপনিষদে আছে 'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ'। বাস্তবিকই জ্ঞানের জন্যই গুরুর আবশ্যক নচেৎ গুরুর আর কি প্রয়োজন? তানসেন জ্ঞানের জন্য গুরুর আবশ্যকতা মানিতেন, কিন্তু অন্য গুরুর অপেক্ষা জ্ঞান স্বয়ং যেরূপ গুরু এরূপ গুরু কেহই নয়, তাই তিনি জ্ঞানকে গুরুর মধ্যে মণিস্বরূপে কহিয়া গিয়াছেন "গুরুণমণজ্ঞান" গুরুর মণি জ্ঞান; ইহাতেও তিনি সন্তুষ্ট হইলেননা, সেই জ্ঞানাধার জ্ঞানস্বরূপকে আরাধনা না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না ঈশ্বরকে বলিলেন "তুঁহি জ্ঞান"। ইহা বলিয়া তাঁহার প্রাণে যেন জ্ঞানের পরিসমাপ্তি হইয়াছিল, সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। এই তুঁহি জ্ঞান কথাটীতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে তানসেনের কিরূপ ঈশ্বর-জ্ঞানের সঙ্গে ঈশ্বর প্রীতি ছিল; তিনি জানিয়া শুনিয়া পরমেশ্বরকে প্রীতি করিতেন। পরমেশ্বরে প্রীতির নিদর্শন তাঁহার গানে বিস্তর আছে। তিনি কোন গানে ঈশ্বর দর্শন লাভের জন্য ব্যাকুল দেখায়ায় কোন গানে ঈশ্বরকে প্যারে অর্থাৎ প্রিয়তম বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। এইরূপে তানসেনের গানে জ্ঞান ও প্রীতির একটী বিচিত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বুঝিতেন যাঁহাকে প্রীতি করা যাইতেছে তিনিই জ্ঞানস্বরূপ আর যাঁহাকে জ্ঞানে জানিতেছেন তিনি তাঁহার প্রিয়তম প্রেমস্বরূপ। এই জ্ঞান ও প্রীতির সম্মিলনে তানসেনের অন্তকরণ বড়ই মধুর আকার ধারণ করিয়াছিল। তিনি সেই উদার উন্নত হৃদয়ে বিচিত্রবিশ্বে সেই নিত্যশব্দ

ব্রহ্মের অদ্বিতীয় ও প্রেমপূর্ণ অনন্ত মহিমা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন। তিনি প্রাণ খুলিয়া গাহিয়াছেন—"একহি অনন্ত হোয় ব্যাপো সংসার।" তুমি একই অনন্ত হইয়া সংসার ব্যাপিয়া রহিয়াছ। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ঈশ্বর এক, তিনি অনন্ত এবং সমুদয় সংসারে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি যেরূপ নিরন্তর নিরলসভাবে সাধন করিতেন তাহাতে তাঁহার পক্ষে ব্রহ্মানুভূতি কিছু বিচিত্র নহে। তানসেন সংসার ত্যাগ করিয়া উদাসভাবে শ্রবণ মননাদি দ্বারা কত সাধনা করিতে লাগিলেন; তাহার ফলে তিনি ব্রহ্মকে অনুভব করিয়া গাহিতে সমর্থ হইয়াছেন—"একহী অনন্ত হোয় ব্যাপোঁ সংসার। * * তুঁহী জ্ঞান তুঁহী ধ্যান সকল শাস্ত্র তানসেন তুঁহী বিচার। তানসেন তর্ক বিতর্কের সাহায্য না লইয়া সরলভাবে তাঁহাকে ডাকিতেন, তাঁহার মহিমাগান করিতেন। তাঁহাকে একমাত্র সকলের মূলাধার জানিয়া কাহাকেও তিনি হেয়জ্ঞান করিতেন না। সকলের প্রতি তাঁহার সমদৃষ্টি জন্মিয়াছিল; সকলকেই তানসেন সেই বিষ্ণুর অংশরূপ দেখিতেন। তিনি যোগীর ন্যায় কোন সম্প্রদায়ে বদ্ধ হইতে চাহিতেন না। তিনি সকল সম্প্রদায়কেই ভাল বাসিতেন। তাঁহার এই উদার অন্তঃকরণ ছিল বলিয়াই তিনি হিন্দুর পুরাণকেও যেমন ভাবে দেখিতেন, মুসলমানের কোরাণকেও সেইরূপভাবে দেখিতেন। হিন্দু মুসলমান সকলকেই সমদৃষ্টিতে দেখিতে চেষ্টা করিতেন।

তিনি যোগীর ন্যায় হিন্দু মুসলমান উভয়কেই সম দৃষ্টিতে দেখিতে চেষ্টা করিতেন। মাঝে মাঝে এই ভাবটী কিঞ্চিৎ হারাইয়া ফেলিতেন; তাঁহার পূর্ব্ব হিন্দুর ভাব ভস্মাবৃত অনলের ন্যায় জাগিয়া উঠিয়া স্মৃতিপথে সমারূঢ় হইয়া তাঁহাকে মুসলমানের প্রতি ঈষৎ হেয়চক্ষে দেখিবার জন্য তাঁহার প্রাণকে উত্তেজিত করিত, কিন্তু তিনি মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহা আবার সামলাইয়া লইতেন। একবার তিনি তাঁহার দুই প্রভুর প্রতি আশীর্ব্বাদ দিবার সময় তাঁহার হিন্দু-রাজা রামচন্দ্রকে বলিলেন "অচলরাজ করো কোট বরষলোঁ চিরঞ্জিব রহো রাজাধিরাজ রামচন্দ্র"। আর আকবার সাহকে বলিলেন "অচলরাজ করো লাখবরষলোঁ কায়ম রহো মহম্মদ সা আকবর সা পাতসাহ।" তাঁহার প্রভু হিন্দুরাজার বেলায় বলিলেন কোটীবর্ষ আর তাঁহার মুসলমান

প্রভুর বেলায় করিলেন লাখবর্ষ। হিন্দুরাজার প্রতি মুসলমান প্রভুর অপেক্ষা শতগুণবেশে আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু পরে বোধহয় তানসেনের ইহার জন্য আক্ষেপ জন্মিয়াছিল, তিনি সম্ভবতঃ তাই উভয় প্রভুর প্রতি যোগীর সমদৃষ্টি রাখিবার জন্য উভয়কে একত্রে সমভাবে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন—"তানসেন কহে "প্রভু দোউ চিরঞ্জীব রহো"। এই সমদৃষ্টি কি তাঁহার কম সাধনার ফল। এই সমভাব রক্ষা করাইতো যোগ। এই সমভাব পরিহার করিলেই যোগী বস্তুতঃ যোগভ্রষ্ট হইয়া থাকে। সিদ্ধাসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥ এই সমত্ব তাঁহার জীবনের একটী বিশেষ লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; তিনি যে কোন কর্ম্ম করিতেন, যাহা কিছু দেখিতেন শুনিতেন সকলেতেই সমানভাব রাখিতে বিশেষ প্রয়াস পাইতেন। তিনি পার্থিব সিদ্ধি অসিদ্ধির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া নিরপেক্ষ-ভাবে অপার্থিব প্রকৃত সিদ্ধির দিকে যত্ন ও শ্রম করিতেন। এ বিষয়ে সময়ে সময়ে তাঁহার ত্রুটী হইলেও, তানসেনের এই সকল চেষ্টা নিরর্থক হয় নাই। তাঁহার চেষ্টার সুফল ফলিয়াছিল। তিনি অজাতশত্রুর বিমল আনন্দ অনুভব করিয়া স্বীয় গ্রন্থে বলিয়া গিয়াছেন "মন প্রসন্ন আনন্দ তানসেন সব মীত"।

সঙ্গীতের পথ দিয়া যোগযুক্ত হইয়া তানসেন কি আরাম মনে কি প্রসন্নতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে আর নিরানন্দ ছিলনা, তিনি আনন্দযুক্ত থাকিতেন, তাঁহার প্রাণে শত্রুতার মলিনচ্ছায়া আসিয়া মলিন করিতে সমর্থ হইতনা। সকলের সহিত সৌহৃদ্যে তাঁহার হৃদয়ে আনন্দের উচ্ছাস বহিত। এইরূপ আনন্দ ভাব যোগীহৃদয়ে নহিলে সহজে আসেনা। যোগীদিগের সংসারের আমোদ প্রমোদের মধ্যে সতত আত্মার দিকে দৃষ্টি স্থির থাকে, তাঁহারা সর্ব্বদা আত্মদৃষ্টি অভ্যাস করেন, তাঁহারা জানেন যে আত্মাই আনন্দরূপ। উপনিষদে কথিত হইয়াছে " মোদো দক্ষিণপক্ষঃ প্রমোদ উত্তরপক্ষঃ আনন্দ আত্মা।" যোগীদের আত্মা লইয়াই কারবার, যোগীরা আত্মার উপর লক্ষ্য রাখিয়া যোগ সাধন করেন, আত্মার উপর লক্ষ্য রাখিয়াই আনন্দ লাভ করেন। আত্মার যোগভাবের সঙ্গে আনন্দভাবের যে আশ্চর্য্য সংশ্রব আছে তাহা যোগীজনেরা অনুভব করিতে সমর্থ হয়।" যোগী তানসেন

এই আনন্দের অধিকারী ছিলেন। যোগের সঙ্গে এই আনান্দোচ্ছাস তানসেন তাঁহার একটী গানে প্রকাশ করিয়াছেনঃ—"গুণী গন্ধর্ব্ব কিন্নর গায়ে নারদ-মুনি বীনা বাজায়ে অমঙ্গল হোতে দূর দুখ ধন্দ ফন্দ। শুভ ঘড়ি শুভদিন শুভ পল শুভ মহূরত শুভ চন্দ্র শুভ নক্ষত্র তকতঁ বৈঠে সাধ্যা অমৃত যোগ তানসেন মন ভেও আনন্দ।" সঙ্গীতযোগী তানসেনের কি সুধাময় সঙ্গীতময় আনন্দ কল্পনা! গুণী গন্ধর্ব্ব কিন্নরেরা গাহিতেছে নারদমুনি বীণা বজাইতেছেন, অমঙ্গল দুখ ধন্দ ফন্দ সমুদয় দূর হইতেছে। শুভ ঘড়ি শুভ দিন শুভপল শুভ মুহূর্ত্ত, শুভ চন্দ্র, শুভ নক্ষত্র, এমন শুভ সময়ে আসনে উপবিষ্ট হইয়া অমৃত যোগ সাধনে তানসেনের মনে আনন্দ বিরাজ করিতেছে। আত্মার যোগ সাধনে এক অনুপম আনন্দ লাভ করিয়া তানসেন পরমত্মাকে "আনন্দমণি সুখ নিধান" বলিয়া গিয়াছেন। যোগানন্দ বুদ্ধ তানসেনের শিবের নাম "ঝিলমিলানন্দ" ছিল! যোগী না হইলে যোগানন্দ বুঝিবে কিরূপে! এ আনন্দের বিন্দু যে পায় তাহার আর দুঃখ ক্লেশ থাকেনা। কবি সেন দাস তাঁহার সঙ্গীত গ্রন্থে স্বরবিবেকের মধ্যে বলেন।

সকলের শেষেতে আনন্দময় কোষ।
বিন্দু সংযোগেতে জীবআত্মা পরিতোষ॥"

এই আনন্দের বিন্দুতে যে জীবাত্মার পরিতোষ হয় তাহার অন্যতম হেতু নাদ। নাদের ধাতুর সহিত আনন্দের ধাতুর বিশেষ সম্বন্ধ আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে উপনিষদে আত্মাকে আনন্দ বলে। সঙ্গীতশাস্ত্রেও নাদবিন্দুকেও আত্মা এবং আত্মাকে সেই পরমাত্মার প্রতিবিম্ব স্বরূপ কথিত হইয়াছেঃ—"নাদবিন্দু জান্যো এই জীবাত্মা যেই সেই প্রতিবিম্ব পরমাত্মার।" সঙ্গীতশাস্ত্র মতে আনন্দময় কোষ নাদের বিহারস্থলও বটে। নাদ অর্থাৎ জীবাত্মা আনন্দময় কোষে বিহার করিতে পরিতোষ প্রাপ্ত হয়। তাই নাদের সহিত আনন্দের বিশেষ আকর্ষণ আছে। আনন্দে যেন নাদের পরিসমাপ্তি। আনন্দময় বোধ হইলে নাদের কামনা যেন পূর্ণ হয়।

সঙ্গীতশাস্ত্রমতে এই নাদের অসাধারণ ক্ষমতা। নাদের মাহাত্ম্য কে বর্ণিতে পারে?

পশুঃ শিশুর্মৃগোবাপি নাদেন পরিতুষ্যতি।
অতো নাদস্য মাহাত্ম্যং ব্যাখ্যাতুং কেন শক্যতে॥”

“নাদাব্ধেস্তু পরং পারং ন জানাতি সরস্বতী।
অদ্যাপি মজ্জনভয়াত্ তুম্বং বহতি বক্ষসি॥

গীত বাদ্য নৃত্য এ সমুদয় নাদাধীন।

“গীতং নাদাত্মকং বাদ্যং নাদব্যক্ত্যা প্রশস্যতে।
তদ্দ্বয়ানুগতং নৃত্যং নাদাধীনমতস্ত্রয়ম্॥”

সঙ্গীতশাস্ত্রকারেরা নাদের মাহাত্ম্য বলিতে গিয়া শুধু সঙ্গীতকে নাদাধীন বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলেন না। তাঁহারা বলিলেন বর্ণ, পদ বাক্য ব্যবহার—সমুদয় জগৎ নাদাধীন।

“নাদেন ব্যজতে বর্ণঃ পদং বর্ণাৎ পদাদ্বচঃ।
বচসো ব্যবহারোঽয়ং নাদাধীনমতো জগৎ॥”

যোগশাস্ত্রেও বিশেষ রূপে নাদমাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে।

নাদে সঙ্গীত ও যোগের ভাব মিলিত হইয়াছে সঙ্গীতশাস্ত্রকারদিগেরও যেমন নাদ আবশ্যকীয় সেইরূপ নাদ যোগশাস্ত্রেরও অন্তর্ভুক্ত বিষয়। কারণ নাদসঞ্চারী যোগ মহাযোগী শিবের অতিশয় প্রীতিপ্রদ। যোগাভ্যাসের অনুষ্ঠানের দ্বারা এই নাদের সঞ্চার হইয়া থাকে। সেইটী শিবের অতিশয় প্রীতিপ্রদ। শিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—

গোপনীয়ং প্রযত্নেন সদ্যঃ প্রত্যয়কারকঃ।
নির্ব্বাণদায়কো লোকে যোগোঽয়ং মম বল্লভঃ।
নাদঃ সংজায়তে তস্য ক্রমেণাভ্যাসতশ্চ বৈ॥”

“এই যোগ অভ্যাস করিলে ক্রমে সাধকের নাদ সঞ্চার হয়। ইহা সদ্যফল-প্রসবকারী ও নির্ব্বাণদায়ক। ইহা আমার প্রিয়, ইহা সর্ব্বপ্রযত্নে গোপনীয়।”

পূর্ব্বে যোগীরা যোগাভ্যাসের সময় হৃদয়ে নাদ উপলব্ধি করতঃ কতরূপ সঙ্গীতধ্বনি—জলদগম্ভীর সুমধুর রব সকল শুনিতে পাইতেন, এইরূপে তাঁহারা লয় প্রাপ্ত হইতেন। যোগশাস্ত্রে স্পষ্ট তাহার উল্লেখ আছেঃ—

"মত্তভৃঙ্গবেণুবীণা সদৃশঃ প্রথমো ধ্বনিঃ।
এবমভ্যাসতঃ পশ্চাৎ সংসারধ্বান্ত নাশনং।
ঘণ্টানাদ সমঃ পশ্চাৎ ধ্বনির্মেঘরবোপমঃ।
ধ্বনৌ তস্মিন্ মনো দত্বা যদা তিষ্ঠতি নির্ভয়ঃ।
তদা সংজায়তে তস্য লয়স্য মম বল্লভে॥"

এইরূপে যোগাভ্যাস (নাদসঞ্চারক যোগাভ্যাস) হইতে মত্তভৃঙ্গবেণুবীণা সদৃশ প্রথম ধ্বনি হয়; পরে ঘণ্টানাদ, পশ্চাৎ জলদরবোপম গম্ভীর ধ্বনি শোনা যায়। এই মহা সুগম্ভীর ধ্বনিতে যে নির্ভিকচিত্তে মনঃসমাধানপূর্ব্বক থাকিতে পারে তাহারই লয়োপলব্ধি হয়—লয় জন্মে। পুনশ্চ—

"তত্র নাদে যদাচিত্তং রমতে যোগীনো ভৃশং।
বিস্মৃত্য সকলং বাহ্যং নাদেন সহ শাম্যতি॥"

সেই নাদে যখন যোগীদিগের চিত্ত বারবার রমণ করে তখন যোগিগণ বাহ্য-বিষয়সকল বিস্মৃত হইয়া নাদের সহিত শমতা প্রাপ্ত হয়।" যদি কাহারো যোগীর প্রকৃত লয়জ্ঞানের আবশ্যক হয় তাহাহইলে তাঁহার নাদ সাধন করা কর্ত্তব্য। কারণ স্বয়ং নাদের তুল্য লয় নাই "ন নাদ সদৃশো লয়ঃ" ইহা যোগশাস্ত্রে বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে। যোগী তানসেন এই নাদের প্রকৃত তত্ত্ব বিশেষরূপে বুঝিয়া ছিলেন, তাই তিনি নাদে সঙ্গীত ও যোগের মিলন স্থলের পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। সঙ্গীতজ্ঞ যোগী তানসেন তাই বিশেষরূপে নাদসাধন করিতেন। অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া বহ্নিমারুৎ সংযুক্ত ধ্বনি শ্রবণ করিয়া তদনুকরণে নাদ সাধন করিতেন কারণ তিনি জানিতেন যে বহ্নিমারুৎ সংযোগভাব হইতে নাদের উৎপত্তি। বিজ্ঞানেশ্বর বলেন—

নকারং প্রাণনামানং দকারমনলং বিদুঃ।
জাতঃ প্রাণাগ্নি সংযোগাত্তেন নাদোঽভিধীয়তে॥"

নকারের অর্থ প্রাণ আর দকারের অর্থ অনল প্রাণাগ্নি সংযোগ হেতু নাদ বলে। সঙ্গীতবিৎ মতঙ্গমুনি বলেন—

"ন নাদেন বিনাগীতং ন নাদেন বিনা স্বরঃ।
ন নাদেন বিনা নৃত্যং তস্মান্নাদাত্মকং জগৎ॥
নাদরূপঃ স্মৃতো ব্রহ্মা নাদরূপো জনার্দ্দনঃ।

নাদরূপা পরাশক্তির্নাদরূপো মহেশ্বরঃ॥
যদপ্যুক্তং ব্রহ্মস্থানং ব্রহ্মগ্রন্থিশ্চ যঃ স্মৃতঃ।
তন্মধ্যে সংস্থিতঃ প্রাণঃ প্রাণাদ্বহ্নিসমুদ্ভবঃ।
বহ্নিমারুতসংযোগান্নাদঃ সমুপজাতবান॥"

সঙ্গীতশাস্ত্রমতে নাদের নকার নামক প্রাণবায়ু ইহা ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিত আত্মা প্রেরিত চিত্তের দ্বারা দেহজ বহ্নি আহত হইলে সেই বহ্নি দ্বারা পুনরায় ইহা প্রেরিত হয়।

নাভেরূর্দ্ধং হৃদিস্থানান্মারুতঃ প্রাণসঙ্গকঃ।
নদতি ব্রহ্মরন্ধ্রান্তে তেন নাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

এই কারণেই প্রাণাগ্নিসংযুক্ত নাদ সাধিবার সময় যোগী তানসেন অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া সাধিতেন। এই নাদাভ্যাসে তানসেন সঙ্গীতে অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন ও মহাযোগী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভাগবতে আছে সেই মহাশক্তিই নাদের উৎপত্তি কারণ, নাদের মূল। নাদসাধনায় সেই মহাশক্তিতে পঁহুছানো যায়। এই নাদাভ্যাসে তানসেনের সঙ্গীত ও যোগের একত্রে উন্নতি হইয়াছিল। এই নাদের প্রাণাগ্নি প্রভাবেই সম্ভবতঃ যোগী তানসেন রাজসভায় দীপক রাগ গান করিয়া কি জানি কি ক্ষমতাবলে বিকম্পনপ্রযুক্ত বহ্নিমারুতপ্রভাবে আকবরসাহর সভার দীপসমূহ প্রজ্বলিত করিয়া সভাস্থ জনগণকে আশ্চর্য্যান্বিত ও স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, এবং সেই সঙ্গে নিজেও সেই অনল শক্তির প্রভাবে দগ্ধকায় হইয়া মৃতকল্প হইবার উপক্রম হইয়াছিলেন।—কথিত আছে তিনি মৃত্যুদশা প্রাপ্ত হইতেন যদি না তাঁহার কন্যা মল্লার গাহিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতেন। মল্লার বিশুদ্ধ না হওয়াতে তাঁহার সম্পূর্ণরূপে দাহ উপশম করিতে পারে নাই। আজকাল এ কথা অনেকেই হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন, কিন্তু আমি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কথা দিয়া বুঝাইয়া দিব ইহা হাসিয়া উড়াইবার বিষয় নহে। আজকাল vibration কম্পনের তারতম্য লইয়াই বর্ণ, সুর, আলোক সকলই প্রতিপন্ন হইতেছে। যোগী তানসেন দীপকরাগের কিরূপ vibration এর প্রভাবে রাজ সভার বাতি প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, তাহা বুঝাইতে গেলে যোগী তানসেনের ন্যায় সিদ্ধ হইতে হয়। সঙ্গীতের ভিন্ন ভিন্ন সুরের vibration

য়ের বলে যে কতরূপ প্রজ্বলনাদি কার্য্য সাধন করা যায় তাহার দৃষ্টান্ত সম্প্রতি পাশ্চাত্য.বৈজ্ঞানিকেরা পাইয়াছেন।. একটী প্রসিদ্ধ ইংরাজী পত্রে তদ্বিষয় প্রকাশিত.হইয়াছিল " Music, it seems, has not only Charms to sooth the savage beast, but also according to a recently devoloped theory, to explode Dynamite when it is approaching its critical state. Dry fulminate of mercury, which explodes at 342° Farh, exploded at 320 when a certain note was sounded close to it on violin or cornet. The note F exercises a mysterious effect on nitrogen explosious, D on fulminates, and B flat on the explosive iodide of nitrogen.

এই ভিন্ন ভিন্ন স্বরের সাহায্যে যখন এইরূপ ভিন্ন.ভিন্ন দাহ্য পদার্থ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তখন তানসেন যে নাদযোগবলে—দীপক রাগের প্রয়োগ দ্বারা আকবর্‌সাহের সভার দীপসমূহ প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন তাহাতে বিচিত্র কি? আমাদের দেশের এসকল অলৌকিক যোগব্যাপার অনেকে আছেন তাঁহারা অবিশ্বাস করেন। যাঁহারা অবিশ্বাস করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে রণজিত সিংহের রাজত্বকালে; ভারতে যোগবলের যে আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়াছিল—সেই বিষয় মনে আনিতে বলি—যে হরিদাস সাধুর জলন্ত যোগবল দেখিয়া ইংরাজ রাজপুরুষ এবং ডাক্তারগণ স্তম্ভিত হইয়াছিল, যে যোগী হরিদাস সাধুর যোগবলে হৃৎপিণ্ডের কার্য্য স্তব্ধ দেখিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ ডাক্তার মহোদয়গণও অবাক হইয়া গিয়াছিলেন তাঁহার কথা একবার স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। যোগের বল পাশ্চাত্য আলোকে বুঝা বড়ই কঠিন।

যোগবিজ্ঞান বুঝিতে গেলে যোগী হওয়া উচিত, ভারত যোগীদিগের শরণাগত হওয়া উচিত—তাঁহাদিগের শিষ্যত্ব গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এই যোগ সাধনায় যে কি অতন্দ্রিত জাগ্রত শক্তি লাভ করা যায় তাহা যোগী না হইলে বুঝা যায় না। সঙ্গীতবিৎ তানসেনের সঙ্গীতের সঙ্গে যোগবিজ্ঞানও আয়ত্ত ছিল তাই তিনি অগ্নির পার্শ্বে বসিয়া যোগবিষয়ীভূত প্রাণানলাত্মক নাদ সাধন করিতেন। এই যোগসাধনের সঙ্গে সঙ্গে তানসেন গানেও যোগের মাহাত্ম্য

নিনাদিত করিয়া গাহিয়া গিয়াছেনঃ—

"জাগে যোগী ভোগী রোগী কাঁহা জাগে"। *

শ্রীহিতেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

গিরিবালা।

(গল্প)

রামচরণ বাবু তাঁহার কন্যা গিরিবালার জন্মের পর হইতে তাঁহার প্রতি-বেশী এবং সমবয়স্ক বন্ধু রামগোপাল বাবুর সহিত বলাবলি করিতেন যে "দেখ রাম তোমার হরিচরণের সঙ্গে আমার কন্যাটির বিবাহ দিতে হইবে। আমা-দের দুজনের যেমন চিরকাল বন্ধুতা আছে, এই প্রকার যেন ভবিষ্যতেও দৃঢ়ভিত্তিতে ইহা সংস্থাপিত হইয়া যায়"। রামগোপাল বলিতেন "তা ভাই আর বলিতে হয়। তবে কি জান, আজ কালকার কালে আবার ছেলে মেয়েদেরও মত লইতে হয়। তাহারা বাপমায়ের বড় একটা অপেক্ষা রাখে না জানইত। তা বলিয়া তোমার গিরিবালার জন্যে আর কিছু ভাবিতে হইবেনা। তোমার গিরিবালা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবীর অবতারণা। এমন পুত্রবধূ কাহার না লাভ করিতে ইচ্ছা করে।

---

* গত বর্ষের পুণ্যে "বালক তানসেনেদে" ও "তানসেনের বিবাহ" নামক প্রবন্ধদ্বয় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা তানসেন সম্বন্ধীয় তৃতীয় প্রবন্ধ।

তানসেনের এই "জাগে যোগী" গানটী এবং ইহা হইতে ভাঙ্গা বাঙ্গালা ব্রহ্মসঙ্গীতটীর স্বরলিপি বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

বামাচরণ বাবুর তিনটী পুত্রের পর কন্যাটী হইয়াছে। সেই জন্য গিরিবালা পিতামাতার অত্যন্ত আদরের ধন। জনক জননীর স্নেহরসে পরিসিক্ত হইয়া কন্যাটী কমলার ন্যায় দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

বামাচরণ বাবু চিরকালই স্বদেশহিতৈষী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি স্বদেশের উন্নতির জন্য কি না করিতেন। হুগলীর মধ্যে তিনিই প্রথমে তাঁহার কন্যাকে রীতিমত পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রদানে যত্নবান হইলেন। প্রখরবুদ্ধি গিরিবালা অল্পকালের মধ্যে ইংরাজী, বাঙ্গলা, ও সংস্কৃত ভাষায় অধিকার লাভ করিলেন। তিনি পিতা ও শিক্ষকের সাহায্যে অনেক ভাল ভাল ইংরাজী ও সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়া জ্ঞান-পিপাসা চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। গিরি-বালার যশঃসৌরভ হুগলীর মধ্যে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। কন্যার জ্ঞানস্পৃহা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, নম্রস্বভাব-চরিত্র, পিতামাতা ও গুরুজনের প্রতি ভক্তি প্রভৃতি সদ্গুণরাশি দর্শন করিয়া বামাচরণ বাবুর আর আনন্দের অবধি রহিলনা।

রামগোপাল বাবুর পুত্র হরিচরণ কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিল। রামগোপাল একমাত্র পুত্র হরিচরণকে অতিরিক্ত আদর দিয়া তাহার একরকম মাথা খাইয়া বসিয়াছেন; তাহার লেখা পড়াতে তিনি ততটা যত্ন করিতেন না। তিনি মনে করিতেন "আমার এক ছেলে, বিষয় আশয়, টাকাকড়ি যাহা আছে, তাহাতেই তাহার অনায়াসে চলিয়া যাইবে। আর একটু বড় হইলে সে অল্পস্বল্প পরিশ্রমেই লেখা পড়া শিখিয়া ফেলিতে পারিবে।" হরির মা যদি বলিতেন "বাবা হরি বাহিরে যাও, তোমার পণ্ডিত মহাশয় এসেছেন, দুকলম লিখে ও একছত্র পড়ে এসো।" অমনি হরিচরণের মাথা ধরিত, পেটকামড়াইত, কি একটা ছুতো করিয়া কাঁদিতে বসিত। আর রামগোপাল বাবু পুত্ররত্নকে কোলে তুলিয়া চুম্বন করিয়া বলিতেন "আচ্ছা আজ পণ্ডিতমশায়কে ছুটি দাও। কাল থেকে আমার হরি ঠিক পড়িতে যাইবে।" এই প্রকারে হরি প্রায় প্রতিদিনই নিজের পড়ার সুব্যবস্থা করিয়া লইত।

অপরদিকে রামগোপাল বাবু গিরিবালার লেখা পড়ার কথা শুনিয়া স্বীয় পুত্রের জন্য অন্তরে দুঃখিত হইতেন বটে, কিন্তু এমনি তাঁহার অবৈধ পুত্রবাৎ-সল্য যে পড়িবার নাম করিলে হরির যখন দুই চক্ষু ভাসিয়া যায় তিনি তখন

অস্থির হইয়া পুত্রের পাঠাভ্যাসের কথা পরিত্যাগ করিয়া আদর করিয়া বলেন "ও তো পুরুষমানুষ দুদিনেই পড়া শিখিয়া ফেলিবে।" ক্রমশঃ হরিচরণের গোল্লায় যাইবার পথ পরিস্কৃত হইতে লাগিল। চাণক্য পণ্ডিতের সেই সত্য-বাক্য "মাতাশত্রু পিতাবৈরী যেন বালা নঃপাঠিতা" হরিচরণেতে দিন দিন প্রমাণিত হইতে লাগিল।

২

অতি কষ্টে উপর্য্যুপরি তিনবার ফেলের পর হরিচরণ তৃতীয়বিভাগে এণ্ট্রান্সপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। জীবনে ইহার উপরে যাইবার ক্ষমতা হরিচরণের আছে বলিয়া কেহই বিশ্বাস করিতে পারিলনা। হরিও সাধারণের বিশ্বাস ভ্রমাত্মক প্রমাণ করাটা অশোভন মনে করিয়া মা স্বরস্বতীর কাছে করপুটে বিদায় লইলেন। ইহার কিছুদিন পরে রামগোপাল বাবুর কাল হয়। মৃত্যুর সময় রামগোপাল বাবু বন্ধুবর বামাচরণ বাবুর হাতে হরিচরণকে সমর্পণ করিয়া গিরিবালার সহিত স্বীয় পুত্রের বিবাহের প্রতিজ্ঞা যেন রক্ষা করা হয়, এই অনুরোধ-করিয়া গেলেন।

বামাচরণ বাবুও হরিকে আপনার ছেলের মত করিয়া যত্ন করিতেন ও ভাল বাসিতেন। হরিচরণের স্বভাবের উপর যদিও তিনি পরিতুষ্ট ছিলেন না, তবু তাঁহার মৃত সুহৃদ রামগোপালের অনুরোধ ও ভালবাসার খাতিরে গিরিবালার সহিত সেই পরিণয়ে ইচ্ছুক ছিলেন। সেই জন্য গিরিবালা ও হরিচরণের মধ্যে যাহাতে ভালবাসা জন্মে, তাহার চেষ্টা করিতে তিনি ত্রুটী করিতেন না। প্রজাপতির ইচ্ছা, হরিচরণ গিরিবালাকে লাভ করিবার জন্য উত্তেজিত হইয়া উঠিল; কিন্তু গিরিবালার মনে, কুচরিত্রাদি দোষে দূষিত হরিচরণের প্রতি ঘৃণাতে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। তিনি স্থির করিলেন হরিচরণ কস্মিনকালেও তাঁহার স্বামী স্থানীয় হইতে পারিবে না। পিতার আদেশে হরিচরণের সাক্ষাতে তিনি অনিচ্ছাসত্বেও কখন কখন বাহির হইতেন বটে, কিন্তু যত শীঘ্র সম্ভব সেই বিরক্তিকর স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন।

অতঃপর বামাচরণ বাবুর আর বুঝিতে বাকী রহিলনা যে নিজ দুহিতার সহিত, তাহার বান্ধবতনয় হরিচরণের পরিণয় সম্বন্ধ অসম্ভব। তিনি কন্যাকে

এত ভাল বাসিতেন যে তাহার মতের বিরুদ্ধে কখন কোন কার্য্য করিতেন না। উপস্থিত ক্ষেত্রেও তিনি গিরিবালাকে কিছুই বলিতে সাহসী হইলেন না। রামাচরণ বাবু হরিচরণকে স্পষ্টই বলিয়া দিলেন যে গিরিবালার অমত হেতু বিবাহ হইতে পারিল না। এই নির্দ্দয় সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া শোকে দুঃখে হরিচরণ ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। অন্তরে ক্রোধ ও প্রতিহিংসার বহ্নি জ্বলিতে লাগিল।

৩

গিরিবালার জন্য চারিদিক হইতে বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। গিরিবালা আসাম প্রদেশের গৌহাটী নগরের প্রধান উকীল শরৎচন্দ্র ঘোষের গলায় বরমাল্য প্রদান করিলেন। হুগলীতে অতি সমারোহে শরৎ বাবুর সহিত গিরিবালার বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। শরৎ বাবু গৌহাটীর জজকমিশ্যনরের আদালতে ওকালতি করেন। তিনি শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোকরঞ্জন লোক। বয়স ২৬।২৭ বৎসরের বেশী নহে। বিবাহের পরেই তিনি গিরিবালাকে লইয়া গৌহাটী চলিয়া গেলেন। কোন্ দূর দেশে গিরিবালা চলিয়া যাইবে শুনিয়া তাহার মাতা, বন্ধু বান্ধব সকলেই দুঃখিত হইয়া কাঁদিতে বসিলেন। রামাচরণ বাবুও অবশেষে শোকাবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া কন্যা আর জামাতার মস্তক চক্ষুজলে সিক্ত করিয়া ফেলিলেন। গিরিবালা মধুর বচনে জনক জননী ও আত্মীয় স্বজনকে সান্ত্বনা করিয়া বিদেহ তনয়া সাধ্বী সীতার মত কর্ত্তব্য পালনে পতিগৃহে গমন করিলেন।

৪

গিরিবালার ভূরি ভূরি সদ্গুণের মধ্যে এই একটি ছিল যে তিনি কিছুতেই অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন না। তাঁহাকে যেমন অবস্থায় ফেলিয়া দিবে তিনি সেই অবস্থার মধ্যে কেমন পরিষ্কার পরিপাটী করিয়া সব গুছাইয়া লইবেন। ইংরাজীতে যাহাকে adaptability বলে সেইটী তাঁহার শরীরে সম্পূর্ণ মাত্রায় ছিল। যে স্থানেই যান, যেমন অবস্থায় পড়ুন তিনি অল্পক্ষণের মধ্যে আপনাকে সেই স্থানের ও সেই অবস্থার সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া লইতেন। মন চির-প্রফুল্ল। স্বামীর সেবা ও গৃহকার্য্যে চিরঅনুরক্তা। শরৎ বাবু এমন গুণবতী স্ত্রীরত্ন লাভ করিয়া আপনাকে পরম ভাগ্যবান মনে করিতে লাগিলেন। গিরিবালার ব্যবহারে শরৎ বাবুর পরিজন ও ভৃত্যবর্গ অল্পকালের মধ্যে পরি-

তৃপ্ত হইলেন। শাশুড়ী মনে করিলেন তাঁহার গৃহে স্বয়ং লক্ষ্মী উপাগতা। গিরিবালা গর্ত্তধারিণী জননী অপেক্ষাও শাশুড়ী মাতাকে ভক্তি ও ভালবাসাতে পরিপ্লুত করিলেন। প্রতিদিন গৃহকার্য্য, অতিথি সেবা, বন্ধু বান্ধবের শুশ্রূষা, গৃহপালিত পশুপক্ষীদিগকে যত্ন ও লালন পালন, বাগানের গাছপালার তত্ত্বাবধারণ নিজে করিয়া অবশিষ্ট সময় লেখাপড়া ও সুকুমার বিদ্যাতে তিনি ক্ষেপণ করিতেন। পুণ্যের সুবিমল কিরণে শরৎ বাবুর গৃহ শান্তিময় হইয়া পড়িল।

৬

কার্ত্তিক মাস বিকাল বেলা। পাঁচটা অনেকক্ষণ বাজিয়া গিয়াছে। রাস্তার দুধারে নাগেশ্বর, পলাশ, কাঞ্চন, চম্পা প্রভৃতি বৃক্ষগুলি সারাদিন রৌদ্রে পুড়িয়া সন্ধ্যার মৃদু মধুর সুশীতল সমীরণে যেন নিজ গাত্র স্ফূর্ত্তি বোধ করিয়া আনন্দে হেলিতেছে দুলিতেছে। ছোট ছোট ফুলগাছ গুলি গোধূলির ফুর ফুরে বাতাসের স্পর্শ মাত্রেই রোমাঞ্চিত হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। গোগণ পদধূলি উড়াইতে উড়াইতে গোধূলির অন্ধকার আরো যেন আঁধার করিয়া চলিয়াছে। চারিদিক হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে বন্যরাজহংস, বালহংস, বক, কাক সকলেই আকাশে উড়িয়া উড়িয়া আপন আপন সঙ্গীর সহিত হর্ষোৎফুল্ল রব করিতে করিতে নিজ কুলায় যাইতেছে। অদূরে উমানন্দ দ্বীপ ব্রহ্মপুত্র নদের বক্ষস্থল ভেদ করিয়া দেবাদি দেব মহাদেবের তুহিনবৎ শুভ্র মন্দিরের চূড়া মস্তকে ধারণ করিয়া নিশ্চল নিশ্চেষ্ট ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া সায়ংকালীন আরতি শুনিতেছে। নিকটে উর্ব্বশীশিলা-স্তম্ভোপরিস্থিত কৃত্রিম বিহঙ্গ সন্ধ্যা-সমীরণে মৃদু মৃদু নৃত্য করিতেছে। সূর্য্যদেবও পশ্চিম আকাশ রক্তিম বর্ণে রঞ্জিত করিয়া অস্তাচলে গমন করিয়াছেন। কামাখ্যা পর্ব্বতোপরি ভুবনেশ্বরী মন্দির সেই অস্তগামী রবির কিরণে সুবর্ণালঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। ঘনপল্লব-রাজিপরিশোভিত বৃক্ষসমূহের কোন নিগূঢ় প্রদেশ হইতে ঐকতানে ঝিল্লীরা গাহিতেছে। এই রকম সময় উকিল বাবুর বাংলার দক্ষিণ বারান্দায় একটি রমণী একখানা ইজিচেয়ারে বসিয়া সতৃষ্ণনয়নে রাজপথের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে কি ভাবিতেছেন। তিনি কাহার জন্য যেন প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। গিরিবালা প্রতিদিন এই সময় তাঁহার স্বামী কোর্ট থেকে ফিরিবার সময় বুঝিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকেন। আজ অন্য দিন অপেক্ষা

শরৎ বাবুর বাড়ী ফিরিতে একটু দেরী হইয়াছে; সেই জন্য একটু অধিক চঞ্চলা হইয়া উঠিতেছেন। তিনি রাজপথে স্বদৃষ্টি স্থির রাখিয়া বেত্রাসনে এপাশ ওপাশ ফিরিতেছেন। একবার উঠিয়া দাঁড়াইতেছেন ও একবার বসিতেছেন। অথচ হঠাৎ আজ মন এত উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে কেন তাহাও ভাল বুঝিতে পারিতেছেন না। এমন সময় শরৎ বাবুর মত একটি লোক বাড়ীর দিকে আসিতেছে দূরে দেখিতে পাইলেন। স্বামী আসিতেছে মনে করিয়া তাঁহার মন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত পরে মনে হইল; যেন তাঁহার স্বামী নয়, অন্য কেহ। উৎফুল্ল বদন মলিনতা প্রাপ্ত হইল। গোধূলির ঝাপসা ছায়া কৃষ্ণবর্ণ বৃক্ষরাজির সহিত মিশ্রিত হইয়া এক প্রকার আলো-আঁধার সৃষ্টি করিয়া দিঙ্মণ্ডল এমন আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে যে ভাল করিয়া চেনা যাইতেছে না,—মৃদুপদবিক্ষেপী আগন্তুকটী কে? একমূহূর্ত্তের মধ্যেই এক একবার মনে হইতেছে তাঁহারি স্বামী, পরক্ষণেই মনে হইতেছে স্বামী তো নয়। সান্ধ্যসমীরণবিকম্পিত বৃক্ষপত্রের ন্যায় তাঁহার হৃদয় আশা-নিরাশায় কম্পিত হইতে লাগিল। ক্রমে সেই ব্যক্তি যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল ততই তাঁহার ধারণা স্পষ্ট হইতে লাগিল যে সে তাহার স্বামী নয়। আগন্তুক অতি নিকটবর্ত্তী হইতেই দেখিলেন বাস্তবিকইতো তাঁহার স্বামী নহে, বাল্যকালের পরিচিত প্রতিবেশী হরিচরণ।

মুহূর্ত্তমাত্রেই গিরিবালার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, বাত্যাহত কদলীপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। প্রায় এক মাস অতীত হইয়া গেল, বামাচরণ বাবু হুগলী হইতে হরিচরণের ক্ষয় কাশীরোগে মৃত্যু হইয়াছে, বলিয়া, তনয়াকে চিঠি লিখিয়াছিলেন। পিতার হস্তলিখিত পত্র অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। মৃত হরিচরণ এখন কি করিয়া হঠাৎ গৌহাটীতে উপস্থিত হইলেন, গিরিবালা ভাবিয়া পাইলেন না। মুহূর্ত্তমধ্যে মনে এই সব চিন্তা করিতে করিতে দেখিলেন হরিচরণ গিরিবালার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, তাহাকে সেই পুরাতন কণ্ঠে সম্বোধন করিতেছে "কি গিরি ভাল আছ তো?" গিরিবালা নিরুত্তর হইয়া চেয়ারে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন।

৬

রাত্ত প্রায় আটটা বাজিয়া গিয়াছে। গিরিবালার যেন মূর্চ্ছা ভাঙ্গিতে

আরম্ভ হইল। তিনি অল্প অল্প নড়িতে লাগিলেন। কিন্তু চোক যেন কিছুতেই খুলিতে সাহস করিতেছিলেন না; পাছে সেই মূর্ত্তি নয়ন গোচর হয়। স্বামীর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া সাহসে বুক বাঁধিয়া অতি ধীরে ধীরে নয়ন নিমীলিত করিলেন। দেখিলেন স্বামী হাতপাখা লইয়া আস্তে আস্তে ব্যজন করিতেছেন এবং তাঁহার শাশুড়ী মাতা নিকটে বসিয়া আছেন।

শরৎ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন আছ? তিনি উত্তর দিলেন একটু জল দাও, ভাল আছি। তারপরে ক্রমে সব ঘটনা বিবৃত করিলেন। শরৎ বাবু ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, ইহা মূর্চ্ছারোগ, বা হিষ্টিরিয়া। ডাক্তারের ব্যবস্থা মত স্ত্রীকে ঔষধপত্রাদি ব্যবহার করাইতে লাগিলেন। এক দিন পরেই গিরিবালা সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন। এই ঘটনা যাহারা যাহারা শুনিয়াছিল সকলেই মিথ্যা কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতে লাগিল। এমন কি গিরিবালার নিজেরও সমস্ত ব্যাপারটা ভুল কল্পনা বিশ্বাস হইতে লাগিল।

আস্তে আস্তে এই বিভীষিকা কল্পনা সকলের মন হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। গিরিবালা ফুল্লমনে পূর্ব্বের ন্যায় স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে লাগিলেন। শরৎ বাবুর সুখী পরিবারের মধ্যে আবার আনন্দের হিল্লোল বহিতে লাগিল। আবার গিরিবালার ময়না সেই পুরাণো কণ্ঠে কথা কয়, চন্দনা রাধাকৃষ্ণ গাহে, ভীমরাজ ঘোড়া, ছাগলের ডাক ডাকে, হরিণশাবক লম্ফ ঝম্প প্রদান করিয়া নবদূর্ব্বাদল ভক্ষণ করে, আবার মল্লিকা, মালতী জাতি, জুঁই, রজনীগন্ধা, নাগেশ্বর, কুরুবক, বকুলের গন্ধে উদ্যান আমোদিত হইতে লাগিল। বৃক্ষলতা পশু, পক্ষী প্রভৃতি সকলেই যেন সেই ঘোষপরিবারের সহিত মিলিত হইয়া অতীতের বিষাদময় স্মৃতিকে ব্রহ্মপুত্রনদের গর্ভে ডুবাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িলেন।

এই ঘটনার ঠিক এক মাস পরে সকালে আটটায় সময় শরৎ বাবু ষ্টাডিতে বসিয়া একটি মোকর্দ্দমার নথি পড়িতেছেন, আর পার্শ্বস্থিত গুড়গুড়ি হইতে মুহুর্মুহ হ্রস্ব দীর্ঘ শব্দ নির্গত করিতেছেন। বাড়ীর আর আর সব লোকেরা স্ব স্ব কার্য্যে নিবিষ্ট রহিয়াছেন। গিরিবালা স্নান করিবার মানসে স্নানাগারে প্রবেশ করিতেছেন। হঠাৎ এমন সময়ে শরৎ বাবু স্নানের ঘর হইতে চীৎকার

ধ্বনি শুনিতে পাইয়া দ্রুতবেগে গিয়া দেখিলেন যে গিরিবালা কাঁপিতেছে। কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করাতে গিরিবালা বলিলেন, "সেই স্নানঘরের দরজা খুলিলাম, দেখি সেই মূর্ত্তি আয়নার কাছে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাস দিয়া চুল আঁচড়াইতেছে। এখন দেখিতেছি কেহ নাই, কোথায় চলিয়া গেল"। শরৎ বাবু প্রবোধ দিয়া বলিলেন যে সেটা তাঁহার দৃষ্টির ভ্রম মাত্র অন্য কিছুই নহে। কিন্তু তিনি মনে মনে বেশ বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার বাড়ীতে কি একটা অমঙ্গলের সূচনা হইতেছে। মাতার অনুরোধে পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আনাইয়া শান্তির জন্য বাড়িতে গ্রহযজ্ঞ শান্তিস্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি অনেক করাইলেন। আসামের মহাপুরুষপন্থী বৈষ্ণবগণদ্বারা বিস্তর ব্যয় করিয়া হরি সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি করাইলেন। সকলের মনে অনেকটা শান্তি আসিল।

ইহার পর শরৎ বাবুর বাড়ীতে অদ্ভুত রকমের দৌরাত্ম্য সকল হইতে আরম্ভ হইল। ভয়ানক বৃষ্টি পড়িতেছে, এমন সময় বাড়ীর ভিতরে যেখানে সব লোক জন বসিয়া আছেন, সেই খানে কোথা হইতে শুষ্ক শক্ত ঢিল বা পাথরবৃষ্টি হইতে লাগিল। এই প্রকার প্রায়ই হইত। পুলিশ কর্ত্তৃক বাড়ীর চারিধারে পাহারা দিয়াও কাহাকেও দেখিতে বা ধরিতে পাওয়া যাইত না। অনেক ইংরাজ শিক্ষিত বড়লোক এই সব অলৌকিক ক্রিয়া দর্শন করিয়াও কোন তথ্য নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইলেন না।

প্রায় আর এক মাস পরে একদিন সন্ধ্যার সময় গিরিবালার শয়ন কক্ষ হইতে "আমাকে হরিচরণ নিয়ে গেল রে" চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া সকলেই দৌড়িয়া গিয়া দেখিলেন, গিরিবালা শয্যা হইতে প্রায় দশহস্ত পরিমিত দূরে পড়িয়া রহিয়াছেন। শীর্ণ দেহ পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া প্রাণ-পাখী পলায়ন করিয়াছে।

ক্রোমোলিথোগ্রাফি।

ক্রোমোলিথোগ্রাফি অর্থাৎ লিথোগ্রাফির সাহায্যে নানা বর্ণবিশিষ্ট চিত্র মুদ্রিত করিবার উপায়। আজকাল আমরা সচরাচর যে সকল অল্পমূল্যের চিত্রাদি দেখিতে পাই ইহার মধ্যে অধিকাংশই ক্রোমোলিথোগ্রাফ। জার্ম্মনী, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে এই শিল্পের বিস্তর উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে ইহা এখনো অনেক শৈশবাবস্থায় আছে। বাঙ্গলায় আজকাল অনেকগুলি সপ্তাহিক ও মাসিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে এবং উহাদের মধ্যে কতকগুলিতে সময়ে সময়ে সুন্দর সুন্দর ছবিও বাহির হইয়া থাকে। কিন্তু একমাত্র 'পুণ্য' ভিন্ন বোধ হয় কোন পত্রেই উক্ত ছবি প্রকাশিত হয় নাই।

লিথোগ্রাফিতে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা না থাকিলে ক্রমোলিথোগ্রাফি শিক্ষা করা অসম্ভব। এস্থলে লিথোগ্রাফ প্রস্তুত করিবার প্রণালী সংক্ষেপে বলিয়া ক্রমোলিথোগ্রাফির বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করা উচিৎ। লিথোগ্রাফি কি তাহা বোধ হয় কোন শিক্ষিত ব্যক্তির অবিদিত নাই, তথাপি কর্ত্তব্যবোধে একটু লিখিতে হইল। কাষ্ঠের, সীসার বা অন্য কোন ধাতুর অক্ষর বা ছাপাখানার যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল সামান্য রাসায়নিক উপায়ে এক প্রকার প্রস্তরের সাহায্যে ছাপার নাম লিথোগ্রাফি। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে জর্ম্মনীর অন্তঃপাতী মিউনিচ নগরে সেনফেলডার নামে একজন দরিদ্র অভিনেতা ইহার আবিষ্কার করেন। ইহার দ্বারা পুস্তকাদি ছাপিলে অতি সামান্য ব্যয়েই কার্য্য হয়; অথচ ইহাতে পরিশ্রম অল্প, এবং সময়ে সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা যে সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না, ইহা দ্বারা তাহা হয়।

আমরা সকলেই জানি, যে স্থলে চর্ব্বি বা কোন তৈলাক্ত পদার্থ থাকে সেই স্থানে জল লাগিতে পারেনা, এবং যে স্থানে জল থাকে সে স্থলে চর্ব্বি বা তৈল লাগিতে পারেনা ; অর্থাৎ তৈলাক্ত পদার্থের সহিত আর্দ্র পদার্থ মিশ্রিত হইতে পারেনা। কেবল এই নিয়মের দ্বারাই লিথো ছাপা হইয়া থাকে। লিথোগ্রাফির প্রধান উপকরণ একখানি লিথো-প্রস্তর, এই প্রস্তর ব্যাভেরিয়ার সেলেনহোফেন নগরে উৎপন্ন হয়, দেখিতে ঈষৎ হরিদ্রাভ, ইহার প্রধান গুণ জলের শোষকতা। ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও আমেরিকাতেও এই প্রস্তর পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট। যাহা ছাপিতে হইবে, প্রথমে এইরূপ একখানি প্রস্তরের উপর তাহা লিথোকালী দিয়া লিখিতে হইবে। এই মসী বা লিথোকালী বাজারে বিক্রয় হয়, ইহা মোম, চর্ব্বি, ভুষা, পাত্‌গালা ইত্যাদির দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য লেখা উল্টা হওয়া আবশ্যক, নচেৎ ছাপা উল্টা হইবে। উল্টাইয়া লিখিতে সকলে সক্ষম হন না, সেই কারণে একেবারে প্রস্তরে না লিখিয়া নিম্নলিখিত উপায়টী অবলম্বন করিলে সুবিধা হয়। ছাপিবার বিষয় গুলি প্রথমে একখানি লিথো-কাগজে কলম দিয়া লিখিতে হয়। এই কাগজ কিনিতেও পাওয়া যায়, ইহাতে শ্বেতসার (Starch) গঁদ ও ফট্‌কিরি উষ্ণজলে দ্রবীভূত করিয়া মিশ্রিত করত একপৃষ্ঠায় মাখান আছে। পরে লেখা বেশ শুষ্ক হইলে কাগজ খানির যে পৃষ্ঠায় লেখা আছে ঐ পৃষ্ঠায় জল মাখাইয়া প্রস্তরের উপর বসাইয়া একটু জোরে চাপ্‌ দিলে লেখা অংশগুলি প্রস্তরে লাগিয়া যায়, এইবার কাগজখানি তুলিয়া ফেলিলেই প্রস্তরের উপর লেখার কার্য্য শেষ হইল। ইহার দ্বিতীয় কার্য্য প্রস্তরের উপর লেখা অংশে কালী লাগান, ইহা অত্যন্ত কঠিন না হইলেও, বিশেষ সাবধানের প্রয়োজন। প্রস্তরখানির উপরে এইবার ভিজা স্পঞ্জ বা পাতলা পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড দ্বারা একবার সমস্ত স্থানে জল মাখাইতে হইবে, যেন কোন স্থানে একটুও না ফাঁক পড়ে ; কারণ যেস্থলে যেরূপ আকারের ফাঁক পড়িবে কাগজেও ঠিক সেই আকারের দাগ্‌ হইবে। প্রস্তরখানি আর্দ্র থাকিতে থাকিতেই রোলারের দ্বারা ছাপার কালী লাগাইতে হইবে, প্রস্তর ভিজা থাকিতে কালী কেবল লেখার উপরেই লাগিবে, কারণ ছাপার কালী তৈলাক্ত, অতএব ইহা তৈলবৎ পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইবে, জলের সহিত মিশ্রিত হইবেনা। এইবার ইহার তৃতীয় কার্য্য

কাগজে ছাপা। কালী লাগান হইলেই, যে কাগজে ছাপা হইবে সেই কাগজখানি প্রস্তরের উপর বসাইতে হইবে এবং তৎক্ষণাৎ এক খণ্ড সমতল কাষ্ঠের দ্বারা কাগজখানির সকল অংশে একবার ঘর্ষণ করিয়া লইলেই ছাপা হইয়া যাইবে। একবার কালী দিয়া তিন, চারি খানি কাগজ ছাপা যায়; আর, প্রস্তরে একবার লিখিয়া প্রায় সপ্ততি সহস্র খানি পর্য্যন্ত ছাপা যাইতে পারে; তবে শেষের গুলি অপেক্ষাকৃত অপরিষ্কার হয়। অধিক পরিমাণে ছাপিতে হইলে ও পরিষ্কার ফললাভ করিতে হইলে একটি লিথো-প্রেসের প্রয়োজন।

লিথোগ্রাফি কি এবং কি রূপে উহার কার্য্য হইয়া থাকে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করা গেল। এইবার আমরা ক্রোমোলিথোগ্রাফি দ্বারা নানা বর্ণের চিত্র মুদ্রিত করিবার প্রণালী লিখিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ক্রোমোলিথোগ্রাফ প্রস্তুত প্রণালী লিথোগ্রাফ প্রস্তুত অপেক্ষ অধিক কঠিন না হইলেও কিছু জটিল। যতগুলি বর্ণের দ্বারা চিত্র মুদ্রিত করিতে হইবে ইহাতে ততগুলি লিথো-প্রস্তর ও তত প্রকার ছাপার রংয়ের প্রয়োজন। মনে করুন একটি ফুলের গাছ পাঁচ প্রকার রংয়ের সহিত ছাপিতে হইবে। ইচ্ছামত চিত্রটি সরল ভাবে অর্থাৎ সেড্ ইত্যাদি না দিয়া কেবল পার্শ্বের রেখা (outline) গুলি প্রথম প্রস্তরের উপর কৃষ্ণবর্ণ মসী দ্বারা কলমে করিয়াই হউক বা কথিত উপায়ে লিথো কাগজের সাহায্যে অঙ্কিত করিতে হইবে। পরে যতগুলি কাগজ ছাপিবার প্রয়োজন ছাপিয়া লইতে হইবে; এবং অবশিষ্ট প্রস্তর কয়খানিতে ছবিখানির একটি করিয়া অনুরূপ করিয়া লইতে হইবে। ইহা করিতে হইলে প্রথম প্রস্তর হইতে ছাপা কাগজ অবিশুষ্ক অবস্থায় বাকী প্রস্তর গুলিতে বসাইলেই প্রস্তরের উপর ছবির অনুরূপ হইবে। এইবার একপ্রকার রং লইয়া ছবির যে যে স্থলে সেই রং দেওয়া আবশ্যক দ্বিতীয় প্রস্তরে অঙ্কিত ছবির সেই সেই অংশে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে রোলার দিয়া লাগাইতে হইবে অর্থাৎ প্রস্তরের যে সকল অংশে রং দিতে হইবে, প্রথমে লিথো কালী দিয়া তুলি দ্বারা সেই অংশে দাগ্ করিয়া লইতে হইবে, বেশ শুষ্ক হইলে রোলারে করিয়া প্রয়োজনীয় ছাপার রং লাগাইয়া প্রথম প্রস্তর হইতে ছাপা ছবিগুলি পুনরায় দ্বিতীয় প্রস্তরে ছাপিয়া লইতে হইবে। তৃতীয় প্রস্তরেও এইরূপ অপর এক প্রকার রং দ্বারা চিত্রের যে যে অংশে সেই রং লাগাইবার আবশ্যক

সেই সকল স্থলে পূর্ব্বের মত রং লাগাইয়া কাগজগুলি ছাপিয়া লইতে হইবে। চতুর্থ প্রস্তরের চিত্রের বাকী অংশগুলি অপর এক প্রকার রং লাগাইয়া কাগজ গুলি ছাপিয়া লইতে হইবে। এই রূপে যত প্রকার রং দিবার প্রয়োজন দেওয়া যাইতে পারে। এখন প্রত্যেক কাগজেই তিন প্রকার বর্ণের একটি করিয়া ছবি মুদ্রিত হইল; কিন্তু এখন কেবল রং দেওয়াই হইল, সেড্ ইত্যাদি চিত্রের যাহা প্রধান আবশ্যকীয় তাহা এখনও বাকী আছে। পঞ্চম প্রস্তরে সম্পূর্ণ ছবিখানিতে যেখানে যে রূপ পাতার শিরা, ফুলের পাপড়ি ও অন্যান্য সেড্ দেওয়া উচিৎ তাহা চিত্রিত করিয়া, উপযুক্ত রং লাগাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় কাগজ গুলি ছাপিয়া লইলেই চিত্র খানি সম্পূর্ণ হইল। প্রত্যেক বার ছাপিবার সময় মনে রাখা উচিৎ যেন কাগজে অঙ্কিত অংশটি প্রস্তরের ঠিক অঙ্কিত অংশে পতিত হয়, ইহার ব্যতিক্রম হইলেই ছবি একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। কাগজের ছবিখানি ঠিক প্রস্তরের ছবির উপর পাতিত করিবার জন্য নিম্ন লিখিত উপায় অবলম্বন করিলে ভাল হয়। প্রথমে সকল কাগজ গুলি এক মাপের কাটিতে হইবে; তৎপরে প্রত্যেক প্রস্তর কয়খানিতে ছবির অনুরূপ তুলিবার সময়, কাগজ খানি বসাইবার পর উহার চারি কোণে প্রস্তরের উপর চারিটি চিহ্ন করিয়া লইলেই হইল। পরে ছাপিবার সময় সাবধানে কাগজগুলি চিত্রের সহিত মিলাইয়া বসাইলেই আর সরিয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই।

অনেক সময় শুধু চিত্রখানি ভাল দেখায় না, অর্থাৎ মনে করুন একটি কোন প্রস্তরমূর্ত্তির চিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে, এস্থলে কেবল চিত্রটি না আঁকিয়া উহা একটি কৃষ্ণবর্ণ বৃত্তের বা ডিম্বাকারের চিত্রের মধ্যে অঙ্কিত হইলে অধিক সুন্দর দেখায়। যখন এরূপ করিবার প্রয়োজন হইবে, তখন প্রথম প্রস্তরে চিত্রের চতুঃপার্শ্বে বৃত্তাকার, ডিম্বাকার বা যে কোন আকারের ইচ্ছা একটি রেখা টানিয়া চিত্র ও রেখার মধ্যে যে স্থান থাকিবে তাহা লিথোকালী দিয়া তুলি দ্বারা বুজাইয়া দিতে হইবে। পরে শুষ্ক হইলে যে রং ইচ্ছা তাহা দিয়া কাগজগুলি ছাপিয়া লইবে। যে স্থলে এরূপ করিতে হইবে সেস্থলে কালী দিয়া ছাপিবার আর প্রয়োজন নাই, প্রথমেই রং দিয়া ছাপিয়া পরে দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম প্রস্তর পর্য্যন্ত যে রূপ লিখিত হইয়াছে সেই রূপ করিলেই

হইবে।

পাঠক পাঠিকাগণ যাহাতে সহজে বুঝিতে পারেন সেই জন্য প্রবন্ধের সহিত কয়েক খানি চিত্র দেওয়া গেল। প্রথম হইতে পঞ্চম খানি প্রস্তরের চিত্র; ষষ্ঠ হইতে নবম খানি কাগজের চিত্র।

অদ্য প্রবন্ধ এই স্থানেই শেষ করিলাম, যদি 'পুণ্যে' স্থান পাই ও সুবিধা হয় তবে লিথোগ্রাফির সাহায্যে ফটো হইতে চিত্র মুদ্রিত করিবার উপায় লিখিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীহরিহর শেঠ।

আদি মানব কে?।

বীরবলের পৃথিবীর মধ্য বিন্দু নির্ণয় করা, আর আমাদের মানুষের আদি বীজ পুরুষ আদিম মানবের স্বরূপ নির্ণয় করাও তুল্য ব্যাপার। কেহই এ পর্য্যন্ত তাল গাছের এ আড়াই হাত—অতিক্রম করিতে পারেন নাই। পারিবেন, ইহাও বড় সম্ভবপর নহে। পারিবেন কি প্রকারে? প্রথম মানুষের সৃষ্টিকালে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র অনন্ত জড়জগৎ এবং জলচর স্থলচর ইতর প্রাণী ভিন্ন দেখিবার জন্য আর কেহই ছিলনা। * অলস প্রকৃতিস্রষ্টাও সর্ব্ববিষয়ে উদাসীন ও সম্পূর্ণ নির্লিপ্তচেতা। কি রূপে তিনি সৃষ্টি করিলেন, প্রথম সৃষ্ট মানুষ কে? এ কথা তিনি আসিয়া বলিয়া দিলেই কিন্তু লেঠা চুকিয়া যাইত

---

* কো দদর্শ প্রথমং জায়মানং অস্থন্বন্তং যদনস্থা বিভর্ত্তি। অথর্ব্ব বেদ—৯ কা ৪ অনু ৪।

কিন্তু তাঁহাকে দিয়া তাহা হইবার নহে। কাজেই প্রত্যেক দেশের পৌরাণিকগণ, অন্ধের হস্তিদর্শনের ন্যায় যাঁহার যাহা খেয়ালে আসিয়াছে তিনি তাহাই লিখিয়া আপন আপন গ্রন্থের স্থূলতা সম্পাদন করিয়াছেন। তাই এক এক দেশে ভিন্ন ভিন্ন এক এক ব্যক্তি আদি মানব বলিয়া পরিজ্ঞাত। এক দেশের ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থেও ঐ কারণে মতদ্বৈধ।

পৌরাণিক প্রহেলিকাপূর্ণ বাইবেলে আদম ও হবা আদি মানবমিথুন বলিয়া বিশেষিত। কিন্তু উহা প্রমাদশূন্য প্রকৃত তথ্য নহে। কেন না প্রথম-সৃষ্ট মানুষের মা বাবা খুড়া জেঠা কেহই ছিল না, সুতরাং উঁহারা তৎকালে কাহার দ্বারা ঐ নামে আহূত হইতেন? তাঁহাদিগের ঐ নাম কেই বা রাখিয়াছিল? আদিম কালের মানুষ, সভ্যতায় ও জ্ঞানে মানুষ ও পশুর মধ্যবর্ত্তি অবস্থায় ছিল।

প্রথম সৃষ্ট মানুষ হইতে বহু পুরুষপরম্পরা পর্য্যন্ত নাম রাখি-বার প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়া ছিল না, ইহাই আমাদিগের অমোঘ ধারণা। এক হইতে অন্যকে পৃথক্ করার জন্য নাম রাখার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। ইহা কখন প্রথমেই অবলম্বিত হয় নাই। এবং নাম রাখিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার পরেও লিখন পঠনের প্রথা উদ্ভাবিত না হওয়া পর্য্যন্ত বহু বংশপরম্পরার নামাবলী বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া গিয়াছিল।

মানুষ লিখিতে পড়িতে শিখিয়া যখন কুলপঞ্জিকা লিখিবার বুদ্ধি পাইয়াছিল, তখনই বংশের ধারাবাহিক নাম নক্ষত্র লিখিয়া রাখিতে আরম্ভ করে। সুতরাং এহেন উন্নতি লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র লোক, বিনা নামে কাল সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে, সহস্র সহস্র ও লক্ষ লক্ষ লোকের নাম বিস্মৃতি সাগরে বিলীন হইয়াছে। সুতরাং বাইবেলের আদম হবা কিছুতেই প্রথম মানব দম্পতি হইতে পারেন না।

হিন্দুগণ, আপনাদিগের যে পূর্ব্ব পুরুষের নাম স্মরণ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আদম হবা সম্ভবতঃ ঐরূপ কোন ব্যক্তি হইবেন। আদম হবার পূর্ব্বে অকৃত নামা অজ্ঞাত নামা আরও সহস্র সহস্র লোক জনন মরণের বিষয়ী হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ মাত্রই নাই। পরন্তু বাইবেলে আদমের পুত্র কায়িন ও হেবলকে যথাক্রমে কৃষক ও